প্রথম বর্ষ ॥ অষ্টম সংখ্যা ॥ অগ্রহায়ণ ॥ ১৩৮২

আনন্দমেলা

উৎসবের দিনে ছেলেমেয়েদের সঙ্গী

বিনী প্রিন্টস্

সাজগোজের বাহার ছেলেমেয়েদের জন্যেই। রঙবেরঙের চমকদার জামাকাপড় পরে দৌড়ঝাঁপ করার এই তো বয়স। আর সেই জন্যেই বিনী প্রিন্টস্-এর কদর এত বেশি। লোকের চোখে পড়ার মতো, মনে ধরার মতো বাহারী নকশার জন্যেই বিনীর এতো নামডাক। বিয়ে বাড়িই বলুন বা অন্য কোন উৎসবই বলুন— ছেলেমেয়েদের জমজমাট সাজগোজের জন্যে বিনী প্রিন্টস্ না হলেই নয়।

বিনী

ছেলেমেয়েদের মনের মতো
সূতী কাপড়

BCCM-43-75 BEN

আনন্দমেলা

প্রথম বর্ষ ॥ অষ্টম সংখ্যা
অগ্রহায়ণ ॥ ১৩৮২
দেড় টাকা

ছড়া — তিনটে বেড়াল । প্রেমেন্দ্র মিত্র ৪

গল্প — ইলশেঘাই । লীলা মজুমদার ১২
বাঘের থাবা । নীহাররঞ্জন গুপ্ত ২৫
এম্পিয়ারিং । মতি নন্দী ৩৬

উপন্যাস — রাজা হওয়ার ঝকমারি । বিমল মিত্র ১৮
কাপালিকরা এখনও আছে । বিমল কর ২৯

ইতিহাসের গল্প — পরাজিত রাজা । উমা দাশগুপ্ত ৪৮

জানবার কথা — কী করে পথ চলতে হয় । শুভঙ্কর ভাদুড়ী ৮
পয়সাকড়ি । অমিতাভ চক্রবর্তী ২৩

খেলাধুলো — ক্লডিয়াস-পরিবারের কাহিনী । স্ট্রাইকার ৪১
মিনি-ভলিবলে বাংলার খুকীরাই সেরা ৪৪
বাপ কা বেটা ৪৫

কমিক্স — টারজান ৬, ৭, ১০, ১১
টিনটিন । কাঁকড়া-রহস্য ৪৬, ৪৭, ৫০, ৫১

নিয়মিত বিভাগ — ধাঁধা ৫, আচ্ছা বলো তো ৫
জানা না-জানা ৯
অঙ্কের মজা, মজার অঙ্ক ৩৪
ম্যাজিক । পি সি সরকার জুনিয়ার ৩৫
রাজায় রাজায় ৪০
ম্যাজিকের মতো ৪৯
জাদুঘর । শ্রীপান্থ ৫২
তোমাদের পাতা ৫৩
আজব চিড়িয়াখানা ৫৪
বিন্দুবিসর্গ । ইন্দ্রমিত্র ৫৫

প্রচ্ছদ — সুনীল শীল

গত কার্তিক সংখ্যা আনন্দমেলার প্রচ্ছদটি এঁকেছিলেন সুরজিৎ ভট্টাচার্য

সম্পাদক ॥ অশোককুমার সরকার

আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেড-এর পক্ষে অক্ষয়কুমার চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত এবং আনন্দ অফসেট প্রাইভেট লিমিটেড, পি ২৪৮ সি. আই. টি. রোড, কলিকাতা-৭০০০৫৪ থেকে মুদ্রিত।

বিমান মাশুল : ত্রিপুরা ১৫ পয়সা, পূর্বাঞ্চলের অন্যান্য স্থানে ২০ পয়সা

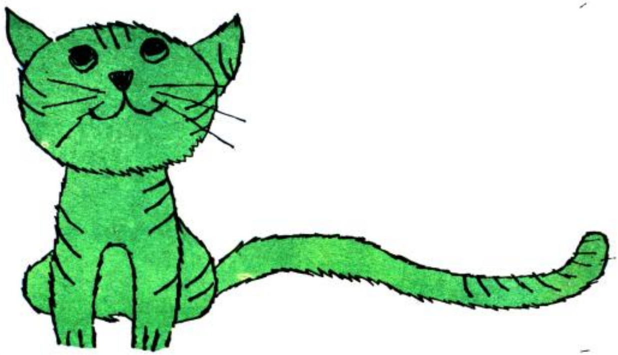

তিনটে বেড়াল

প্রেমেন্দ্র মিত্র

তিনটে বেড়াল, অন্ধকারে
খেলা করে।
আকাশ-জোড়া তেপান্তরে।
একটা কালো, একটা ধলো,
আরেকটা কী?
পাঁশ্‌টে, না পাটকিলে, না
চোখের ফাঁকি?
কেমন করে চিনি তারে
অন্ধকারে!

কালোটা তো রাতের মাঝে-ই
থেকে থেকে যায় হারিয়ে,
ধলোটাকে চাঁদের আলো-ই
কোথায় যেন দেয় তাড়িয়ে।
থাকে যেটা সেটা-ই যেন
যা খ্‌শি রং ধরতে পারে!
ভয় করে যে সেটাও যদি
হারিয়ে যায়,
খ্‌ঁজে তাকে আবার তখন
পাওয়াই দায়।
অন্ধকারে ফ্‌রিয়ে যাবে
তিন বেড়ালের আজব খেলা

দিনের সঙ্গে রাত্তির আর
মেঘলা যেন সাঁঝের মেলা।
সন্ধে তখন হবে শ্‌ধ্‌
স্‌ইচ-টেপা সব
আলোর মালা।
রাত্তিরটা ইচ্ছেমত
তাই নেভানো কিংবা জ্বালা।

ছবি এঁকেছেন ॥ পূর্ণেন্দু পত্রী

ধাঁধার পাতা

ছোট্‌কা যে আমার ওপর হঠাৎ রেগে গেছে কেন, বুঝতে পারছি না। অন্যবার বাইরে থেকে ফিরে আসার পর ছোট্‌কার গল্প আর শেষ হয় না। এবার দেখছি আমার সঙ্গে দেখাই হচ্ছে না।

নিরিবিলি চিলেকোঠার ঘরে ছোট্‌কাকে সেদিন একলাটি পেয়ে গেলাম। ইজিচেয়ারে হেলান দিয়ে আধ-শোয়া ছোট্‌কা, হাতে মোটামতন একটা বই। ঘরে ঢুকতেই আড়চোখে একটু তাকাল, তারপর, যেন দেখতেই পায়নি এমন ভঙ্গিতে হাতের বইটার দিকে চোখ ফিরিয়ে নিল ছোট্‌কা।

কী বলব, কেমন ভাবে বলব, ভাবছি। শেষ পর্যন্ত শব্দ করে একটু কেশে, গলার আড় ভেঙে, জিজ্ঞাসা করলাম, "কী বই পড়ছ ছোট্‌কা?"

"ধাঁধার বই।" ছোট্‌কা চোখ না তুলেই জবাব দিল।

ধাঁধার বই! তার মানে নতুন ধাঁধা পেয়ে যাব এক্ষুনি। ভাবতেই মনটা কেমন হালকা লাগছিল। তখনই ছোট্‌কার গম্ভীর গলা ভেসে এল. "কিন্তু তুমি আর ধাঁধা পাবে না, সতু বাবু।"

ছোট্‌কার গম্ভীর ব্যবহারে এমনিতেই চোখ ছলছল করছিল আমার। তার ওপর এ কী কাণ্ড। ছোট্‌কা যে কেন আর ধাঁধা দেবে না আমায় বুঝতে পারছি না। কোনওরকমে ভাঙা ভাঙা গলায় বললাম, "কেন ছোট্‌কা, কী করেছি আমি?"

"কী আর করবে। মুখ ডুবিয়েছ আমার।" ছোট্‌কা হঠাৎ উঠে বইয়ের তাক থেকে দুটো পত্রিকা টেনে নিয়ে ছুঁড়ে দিল আমার দিকে। তারপর ঝাঁঝ মেশানো গলায় বলে উঠলো. "কী সব লিখেছ এখানে?"

আরে, এ যে দেখছি ধাঁধার পাতা। লাল-নীল পেনসিলে ছোট্‌কা পাশে-পাশে কী সব প্রশ্নের চিহ্ন-টিহ্ন দিয়ে রেখেছে।

কী যে এত ভুল করেছি, মুখ নিচু করে সমানে ভেবে যাচ্ছি। কোনো কূল-কিনারা পাচ্ছি না। মুখে কথা আর সরছে না।

ছোট্‌কা কখন যেন পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। বলল, "এ সি মানে কী বলেছিলাম মনে পড়ছে? অলটার-নেটিং কারেনট। আর তুমি লিখলে কিনা অলটারনেট। ভুলের ধাঁধা দিতে গিয়ে নিজেই ভুল করে বসলে!"

ছি-ছি, তাড়াহুড়োয় এমন ভুলও মানুষ করে। কী বলব ভাবছি, ছোট্‌কা তখন আবার বলল, "আর রচনাবলীর ধাঁধার উত্তরে কী লিখেছ? পোকা প্রথম আর শেষ খণ্ডের দুটো পাতাই মাত্র খাবে—তোমাকে বলে দিলাম। আর তুমি কী না, দু-পৃষ্ঠার হিসেব করে উত্তর করলে ৮০২। দু-পাতা মানে চার পৃষ্ঠা। সুতরাং উত্তর হওয়া উচিত ৮০৪ পৃষ্ঠা।"

এবার আর সত্যিই কিছু বলার ছিল না আমার। চোখ দিয়ে টপ টপ করে জল পড়তে শুরু করেছে কখন।

ছোট্‌কা আমার চুল ধরে মৃদু ঝাঁকানি দিতে দিতে বলল, "মস্ত দিগ্‌গজ হয়েছ। এ-রকম যেন আর না হয়। এই নাও ধাঁধার খাতা।"

কোলের ওপর ধাঁধার খাতাটা রেখে ছোট্‌কা ছাদের দিকে চলে গেল।

তোমাদের প্রথম কাজ এবার, পুরনো সংখ্যার ভুল দুটো শুধরে নেওয়া। এর পর নতুন ধাঁধা দিচ্ছি।

প্রথম ধাঁধা :

আকস্মিক বোঝায় সোজাসুজি,
উল্টে নিলে নির্ভয়তা বুঝি ॥

দ্বিতীয় ধাঁধা : ১০০ থেকে ৫ কবার বিয়োগ করতে পার?

তৃতীয় ধাঁধা : কোন্ বইতে প্রথম দিকে থাকে উপসংহার, শেষ দিকে ভূমিকা, আর বিষয়ের আগেই আসে পরিণতি?

চতুর্থ ধাঁধা : আটটা একই রকম দেখতে বল। তার মধ্যে একটার ওজন কিছু কম। দুবারমাত্র ওজন করে কী করে বার করবে কোন্ বলটার কম ওজন? নিখুঁত দাঁড়িপাল্লাই মাত্র দেওয়া হবে, বাটখারা নয়।

গতবারের ধাঁধার উত্তর (১) ঢাক (২) বন্ধ ঘড়ি (৩) চিতল (৪) নাম।

সত্যসন্ধ

আচ্ছা বলো তো!

প্রঃ মাউন্ট এভারেস্টে ঘুড়ি ওড়াতে গেলে কী চাই?
উঃ একটা লাটাই।

প্রঃ কী অঙ্ক করতে দোতলায় উঠতে হয়?
উঃ সিঁড়িভাঙা।

প্রঃ বলটা যেতে যেতে হঠাৎ দু-আধখানা হয়ে গেল কেন?
উঃ লোকটা কাট করল।

প্রঃ কোন জন্তুর দাদা কলকাতায় থাকে?
উঃ শেয়াল।

প্রঃ ছবি দেওয়ালকে কী বলছে?
উঃ ওরা আমায় ঝুলিয়ে দিল।

প্রঃ আর্কিমিডিসের নাতিকে কোথায় দেখা যায়?
উঃ পড়ার বইয়ে—নীতি থেকে দীর্ঘ ঈ-র মাথা ভেঙে গেলে।

প্রঃ হুমায়ুন ছেলেকে কী বলে-ছিলেন?
উঃ আকবর, মোহনবাগানকে একটার বেশী গোল দিও না বাবা।

প্রঃ কোন শহর ঘিয়ে ভাজা?
উঃ পুরী।

টারজান
এডগার রাইস বারোজ
কিছু মনে কোরো না লিন্ডা, এখানেই আমি ভাল থাকব।
বার্নি তুমি অকৃতজ্ঞ, নইলে নিশ্চয় আমাদের সঙ্গে চলে আসতে।
একদিন যাব। গোটা পৃথিবীকে সেদিন দেখিয়ে দেব আমি কত শক্তিমান!
বার্নি!
কোরক, এখনও আমরা নিরাপদ নই!
ঠিক এই ভয়ই করেছিলাম! যোদ্ধা-মেয়েরা আমার ভাইয়ের উপরে প্রতিশোধ নিল!
এবারে আমরা কোন্ দিকে যাব?
হাওয়ার টানে এখন পাহাড়ের উলটো দিকে...
আরে!
একদল যোদ্ধা! দুর্গের দিকে যাচ্ছে!

আর-একদল যোদ্ধা !
ওরাও দুর্গের দিকে ছুটছে !
হুম্ ! বার্নির বিপদ ঘনিয়ে এসেছে ! ওই বর্ম ওকে বাঁচাতে পারবে না !
বলো কী বুড়ী-মা ?
ওরা কারা, বুড়ী-মা ?
ওরা পাহাড়িয়া উপত্যকার লোক। ওদেরই মেয়েদের হুনলাকা লুঠ করে এনেছিল। আজ ওরা শোধ তুলবে। কিন্তু হুনলাকা তো বেঁচে নেই।
তাহলে...তাহলে বার্নিকেই হুনলাকা ভেবে ওরা আক্রমণ করবে কোরক
বার্নিকে বাঁচাও।
এখন আর তা সম্ভব নয়, লিন্ডা !
যে ওই বর্ম পরে, তারই মাথা খারাপ হয়ে যায়। বার্নিও ক্ষমতা-পাগল হয়ে উঠেছে !
বুড়ী-মা, তুমি ঠিক কথাই বলেছ !
কয়েক ঘণ্টা বাদে...
ওই তো খামার-বাড়ি !
কোরক, তুমিও আমাদের সঙ্গে চলো। নয়তো বার্নির কথা কাউকে বলে বোঝাতে পারব না !
নীচে...
মনে হয়, কেউ নেই !
শুনেছি লর্ড গ্রেস্টোকের ধনসম্পদের অন্ত নেই !
সে-সবই এবার আমাদের হবে !

এর পর দশের পাতায়

কী করে পথ চলতে হয়

শুভঙ্কর ভাদুড়ী

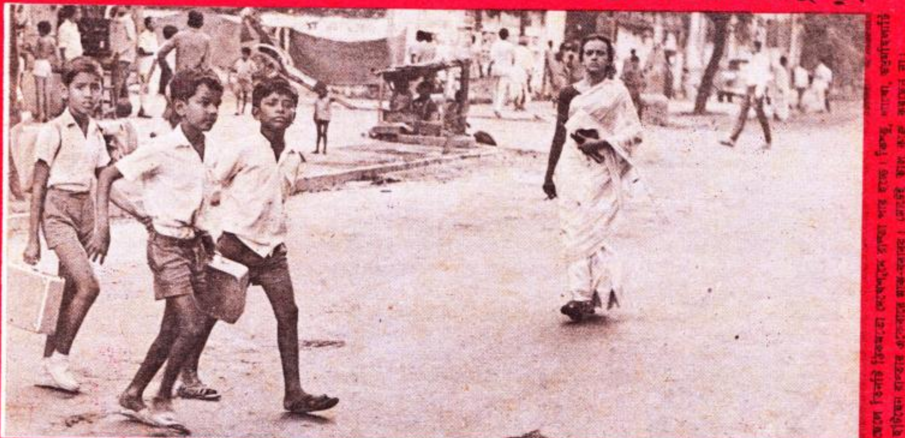

ছেলে তিনটি ঠিকমতো দেখেশুনে রাস্তা পার হচ্ছে। কিন্তু, দ্যাখো, ভদ্রমহিলাটি হাঁটছেন রাস্তার একেবারে মাঝ-বরাবর। মোটেই ভাল কাজ করছেন না।

ঘুড়িটা ছিল তিনরঙা; তাছাড়া আরো তাক-লাগানো ছিল তার ল্যাজটা—মস্ত ঢেউ খেলানো রঙচঙে ল্যাজ। আকাশে জোর প্যাঁচ খেলা হচ্ছে যখন, তখন থেকেই ছেলেগুলো হাঁ করে তাকিয়ে ছিল। তারপর, যাঃ, ঐ তিন রঙাটাই গেলো ভোকাট্টা হয়ে—প্রচুর সুতোটুতো নিয়ে ঘুড়ি তো গোঁত্তা খেতে-খেতে চলল—পেছন-পেছন ছুটলো ছেলেগুলো।

টুটু ছোট্ট বলেই ছিল সবার পেছনে। চোখ তো ঘুড়ির ওপর, আশপাশে কোনো খেয়াল নেই; পার্ক থেকে বেরিয়ে সোজা ফুটপাথে, তারপর রাস্তায়। এমন কী, ভেঁপুর আওয়াজ শুধু কানে যায়নি, কানে যায়নি লোকজনের চিৎকার—কিংবা যা চ্যাচামেচি কানে এসেছিল তা বোধহয় ঐ ঘুড়িটার জন্য—হয়তো এইরকমই মনে-মনে ভেবেছিল টুটু।

খুশিদাদা ভাগ্যিশ এক ধাক্কায় তাকে সরিয়ে দিয়েছিল। না-দিলেই হয়েছিল আর কী। অবশ্য গাড়ি চাপা না-পড়লেও মাথাটা ঠুকে গেলো শানবাঁধা রাস্তার কোণে, তক্ষুনি ফুলে ঢোল, হাঁটুটা ছড়ে গেলো; ততক্ষণে বিকট আওয়াজ করে ব্রেক কষে গাড়িটাও থেমেছে।

চালক নেমে এসে দেখলেন, চোট বেশি লেগেছে কিনা। খুশিদাদা বললেন, "না, তেমন কিছু লাগেনি। ফাঁড়াটা যে ঐটুকুর উপর দিয়েই কেটে গেলো, এই ঢের। ...না, না, আপনার কোনো দোষ নেই। আপনি তো হর্ন দিয়েছেন, পাশ কাটাতে গিয়ে জোরে বাঁকিয়ে দিয়েছেন, ব্রেক কষেছেন। এই টুটুটারই দোষ! আরে, পথে বেরুলে তোর যেমন যাবার অধিকার আছে, তেমনি দায়দায়িত্বও তো আছে। সাবধানে থাকতে হয়—তা কেবল যে নিজের জন্য তা নয়, অন্য পাঁচজনের তাতে কী সুবিধে-অসুবিধে, তাও তো ভাবতে হবে! এই যদি পাশ কাটাতে আপনার গাড়ি উলটে যেতো—যদি ঐ ল্যাম্পপোস্টে ধাক্কা খেতেন—তবে!..."

চালকের নিজের দোষ নেই। এখানে স্কুল আছে বলে ট্রাফিক সাইন ছিল না—তবুও তিনি সবসময়েই সাবধানে গাড়ি চালান। তবু আরেকটু হলেই তাঁরও আজকে হয়েছিল আর কী! তিনি বিনীতভাবে জানতে চাইলেন টুটুকে কোনো ডাক্তারখানায় নিয়ে যাবেন কিনা। কিন্তু খুশিদাদা বাধা দিয়ে বললেন, "না, না, ওর তেমন চোট-জখম লাগেনি। আমিই ওকে বাড়ি পৌঁছে দিচ্ছি। কাছেই বাড়ি। ঐ হলদে রঙের বাড়ির পাশে যে ইঁট-রঙের তেতলা বাড়িটা, টুটুরা ওর দোতলায় থাকে। আপনি কিছু ভাববেন না।"

ভদ্রলোক গাড়িতে উঠে চলে গেলেন।

খুশিদাদা টুটুকে নিয়ে ওর বাড়ির দিকে রওনা হলেন। টুটুর দাদা জয়ন্ত নিশ্চয়ই এতক্ষণে কলেজ থেকে ফিরেছে—ওর সঙ্গেই আড্ডা দেবেন বলে বেরিয়েছিলেন। এবং যেতে-যেতে তাঁর মুখ একবারও থামল না। টুটু পুরো ব্যাপারটায় খুবই হকচকিয়ে গিয়েছিলো—এতক্ষণে ওর মালুম হল ব্যথাটা কপালে ঠিক তেমন নয়, বরং ঐ হাঁটুর কাছটাতে বেশি। ঐ কাহিল অবস্থাতেই সে খুশিদাদার কথা শুনতে লাগল। খুশিদাদা যা বলছেন, সেগুলো হক কথাই বই কী।

"তুই তো শিকারের গল্প পড়িস! জানিস না বাঘ যে-রাস্তায় টহল দেয়, সেখান দিয়ে হরিণ-টরিন যায় না। বুনো হাতির দল আসছে টের পেলেই সব ছোটো জন্তুগুলো তাদের পথ থেকে হাওয়া হয়ে যায়। আসলে রাস্তায়-ঘাটে পথে-বিপথে সাবধানে চলা জন্তুদেরও ধর্ম। ঐভাবে একটু সাবধানে থাকলেই অনেক ঝামেলা তো বটেই, প্রাণটাও বাঁচানো যায়। জন্তুরা জঙ্গলে কেউ কিছু বলে না-দিলেও যে-নিয়মগুলো মানে, এই শহরে তোদের এতবার বললেও তোরা শুনবি না।"

খুশিদাদা এইটুকু ভূমিকা করে টুটুকে রাস্তায় চলবার একেবারে গোড়ার কথাগুলো এক দুই তিন

করে আঙুলে গুনে-গুনে বলে দিলেন।

"পেভমেণ্ট বা ফুটপাথ থাকলে, তার ওপর দিয়ে হাঁটা উচিত। ফুটপাথ নামটাই ঐজন্যে। চারপাশে তাকিয়ে নিরাপদ বুঝলে তবেই ফুটপাথ থেকে রাস্তায় নামা যায়, নইলে নয়। কোনও-কোনও শহরে সাইকেল চলবার জন্যে আলাদা রাস্তা আছে। সে-রাস্তা সাই-কেলকেই ছেড়ে দেওয়া ভাল। যেখানে পেভমেণ্ট বা ফুটপাথ নেই, বা কোনো কারণে সাময়িকভাবে বন্ধ হয়ে আছে, সেখানে রাস্তার ডানদিক দিয়ে হাঁটিতে হয়। তাতে চটপট উলটো দিক থেকে যে-সব গাড়ি আসছে, তা দেখতে পাওয়া যায়—আর দেখতে পেলেই দরকার মতো সহজেই থেমে যাওয়া বা সরে যাওয়া যাবে। ভিড়ের রাস্তায় অনেকে মিলে পাশাপাশি হাঁটিতে নেই। তোদের অনেক সময় দেখেছি, তোরা সবাই মিলে দঙ্গল বেঁধে ক্রিকেটের গল্প করতে-করতে যাস। খবরদার—সে-সব আর করিস না। তাতে একে তো রাস্তার গাড়ি-ঘোড়ার পথ আটকে দেওয়া হয়, সেইসঙ্গে অ্যাকসিডেণ্ট ঘটাবার রাস্তাটাও বেশ খুলে দেয়া হয়। তাছাড়া রাস্তার বাঁকে বা মোড়ে বা এমন কোথাও দাঁড়াতে নেই, যেখান থেকে উলটো-দিক-থেকে-আসা গাড়ির ড্রাইভার তোকে দেখতে পাচ্ছে না। বন্ধুর সঙ্গে যদি বিশ্বনাথ আর প্রসন্নকে নিয়ে উত্তেজিতভাবে তর্কাতর্কি করতে হয় তো সেটা রাস্তার একপাশে দাঁড়িয়ে করলেই হয়। এমন পাগলা ড্রাইভার নেই, যে ছোটোছেলে দেখলেই চাপা বা ধাক্কা দিতে চায়। কিন্তু তোর দিক থেকেও তো অসাবধান হওয়া চলবে না। এই হুজুগে কলকাতায় দেখেছি, কোথাও পান থেকে চুণ খসলেই ভিড় জমে যায়, তামাশা শুরু হয়ে যায়। 'সুকুমার রায়ের 'পাগলা দাশু' পড়েছ তো? অতিরিক্ত কৌতূহল ভালো না, দাশু সেটা ওর বন্ধুদের বলেছিল—কিন্তু কৌতূহল যদি থাকেও, সেটা সাবধানেই চরিতার্থ করা ভালো। ককখনো রাস্তায় নেমে হাঁ করে ঘুড়ির সুতো ধরতে চাওয়া বা তামাশা দেখা উচিত নয়! আর চলতি বাস-ট্রাম থেকে তো কিছুতেই ওঠানামা করা ঠিক নয়। হঠাৎ পা ফসকে যেতে পারে, অন্য গাড়িঘোড়া এসে ধাক্কা দিতে পারে—কত কী হতে পারে। তোর তো আজ অল্পের ওপর দিয়ে গেলো। ঐ হাঁটুর কাছটায় যেখানে ছড়ে গেছে, সেখানে একটু আয়োডিন আর কপালে জলপট্টি দিলেই চলবে। না-হলে থাকতিস হাঁটুভাঙা দ হয়ে পড়ে—পঙ্গু হয়ে—টেরটা পেতিস।" এই বলে খুশিদাদা খটাং খটাং করে দরজার কড়া নাড়লেন। জয়ন্ত দরজা খুলে দিল, সব শুনে আরেক দফা বকুনি, টিনচার আয়োডিনের জ্বলুনি এবং জলপট্টির হৈ-চৈ চলল; সেই সঙ্গে চলল খুশিদাদার কথা।

"মনে রাখবি, ট্রাফিক সিগন্যাল কেবল গাড়ির জন্যই নয়, সবার জন্যে। ভালো ক'রে সিগন্যাল দেখতে হয়। ডাইনে-বামে নজর না দিয়ে পেভমেণ্ট থেকে নামতে নেই, রাস্তা পেরুতে নেই। রাস্তা ফাঁকা থাকলে, সবদিকে খেয়াল রেখে, চটপট রাস্তা পেরুবি। ভয় পাবি না, ছুট লাগাবি না—দোনোমনা করবি না—মাঝখানে গিয়ে মত পালটাবি না। যদি ঠিক করে থাকিস রাস্তা পেরুবি, তো পেরিয়ে যা। কিন্তু আগে থেকে খেয়াল রাখা চাই। তাছাড়া রাস্তা পেরুবার জন্য কতগুলো জায়গা তো ঠিক করেই দেওয়া আছে—জেব্রা আঁকা আছে, ওভারব্রিজ আছে সাবওয়ে আছে—সে-সব ব্যবহার করবি। দাঁড়িয়ে-থাকা কোনো গাড়ির জন্য যদি ভালো করে নজর না করা যায়, তবে তো আরো সাবধান হতে হবে। রাস্তা ফাঁকা বা পরিষ্কার কি না, সেটা না-জেনে কোনো গাড়ির পেছন থেকে হুট করে এগুলেই বিপদ। আরো বিপদ বৃষ্টি-বাদলার দিনে—রাস্তাঘাট পেছল থাকতে পারে, পা হড়কে যেতে পারে, কাজেই বৃষ্টির দিনে খুব সাবধান।"

ততক্ষণে টুটুর হাঁটুর জ্বলুনি অনেকটা কমেছে। খানিকটা ধাতস্থও হয়েছে সে। খুশিদাদা জিগ্যেস করলেন, "আর কোন জিনিসটা সবচেয়ে জরুরি, বল তো?"

টুটু কিছু বলবার আগেই অবিশ্যি খুশিদাদাই বললেন, "অন্যদের সাহায্য করা। রাস্তা পেরুবার সময় ছোটোদের, বুড়োমানুষদের, অন্ধ আর পঙ্গুদের সবসময় সাহায্য করা উচিত। মানুষ মানুষকে সাহায্য করবে না তো করবে কে—তার ওপর যারা সবচেয়ে অসহায়, তাদের সাহায্য করতে হবে সর্বাগ্রে। তোর এমন কিছু তাড়া ককখনোই থাকতে পারে না, যাতে অন্য লোককে সাহায্য করবার জন্য এক মিনিট সময় দেওয়া যায় না।...কী এ-সব কথাগুলো মনে থাকবে তো? ফের যদি দেখি রাস্তা পেরুবার সময় অসাবধান কি অন্যমনস্ক...যাক.. জয়ন্ত, তুই ক্যারমটা বার কর তো। এক দফা হয়ে যাক!"

শঙ্করাচার্য ও কুমীর

আট বছরের একটি ছেলে বলল, "আর মাত্র আট বছর আমার আয়ু, এর মধ্যে যা করার আমায় করতে হবে।" মায়ের কাছে সে সন্ন্যাস নেওয়ার অনুমতি চাইল। কোন প্রাণে মা ওইটুকুন একমাত্র ছেলেকে সন্ন্যাস নিতে দেবেন! কিন্তু কী করে তিনি রাজি হলেন সে সম্বন্ধে একটা গল্প আছে।

মায়ের সঙ্গে ছেলেটি নদীতে চান করতে গেছে। হঠাৎ একটা কুমীর এসে তাকে টেনে নিয়ে চলল। ছেলেটি চেঁচিয়ে বলল, "আমায় সন্ন্যাস নিতে দিলে এখনই কুমীরটা আমায় ছেড়ে দেবে।" মা আর কী করেন! অনুমতি দিলেন। অমনই কুমীর ছেলেটিকে ছেড়ে জলে ডুব দিল।

এই ছেলেই শঙ্করাচার্য নামে জগদ্বিখ্যাত হন। কিন্তু তাঁর মৃত্যু হয় বত্রিশ বছর বয়সে। সে সম্বন্ধেও গল্প আছে। তাঁর লেখা ব্রহ্মসূত্রের ব্যাখ্যা পড়ে স্বয়ং ব্যাসদেব ছদ্মবেশে এসে তাঁকে বর দিলেন, "এখন তোমার প্রচুর কাজ বাকি। তোমার আয়ু দ্বিগুণ হোক।"

মৃত্যুর আগে পণ্ডিতদের শঙ্করাচার্য শাস্ত্রযুদ্ধে পরাস্ত করেন। একে বলে শঙ্করের দিগ্বিজয়। তাছাড়া দক্ষিণে শৃঙ্গেরীমঠ, উত্তরে যোশীমঠ, পশ্চিমে সারদামঠ আর পূর্বে গোবর্ধনমঠ—এই চারটে মঠ স্থাপন করেন। তাঁর মতো অল্প বয়সে জ্ঞানে ও কর্মে, ধর্মতত্ত্বে ও দর্শনে এমন কীর্তি পৃথিবীর ইতিহাসে আর দেখা যায় না।

গুজবটা মিথ্যে নয়। লর্ড গ্রেস্টোক নেই, ওয়াজিরিরাও নেই!
বাড়িতে আলো জ্বলছে না, সব অন্ধকার!
এগিয়ে চলো!
খবার জন্যে উত্তর থেকে দলে-দলে লোক আসছে। লর্ড গ্রেস্টোক নাকি তাদের সাহায্য করতে ব্যস্ত। শিগগির ফিরবে না।
কিন্তু বিশেষ-কিছু আছে বলে তো মনে হয় না!
ওয়াজিরিরা তো গোরু-বাছুর বিক্রি করে না, তাহলে পয়সা পাবে কোত্থেকে?
লনডনের কাছে তো গ্রেস্টোকের মস্ত বাড়ি! ওয়াজিরিদেরও শুনি ব্যাঙ্কে অনেক টাকা!
অর্থাৎ ওদের টাকা আছে!
সেই টাকার কিছুটা আমরা চাই!
চলে এসো!
হয়তো ওদের সোনা কিংবা হীরের খনি আছে!
তার ম্যাপটা খোঁজো!
তন্ন-তন্ন করে সব জায়গায় তল্লাসি চালাও!
বাচ্চার ঘর! এখানে কিছু নেই!
কিছু না!
এরা আবার কারা?

এর পর আগামী সংখ্যায়

ইলশেঘাই

লীলা মজুমদার

মহালয়ার আগের দিন, পানুর নামে ইলশেঘাই থেকে একটা হাতেলেখা টেলিগ্রাফ এল, "কম শার্প ছোটমামা।" হাতে লেখা মানে একটা পঞ্জিকার টেলিগ্রাফের ফর্মে সবুজ কালি দিয়ে হাতে লেখা; চাঁদুমামার নিজের হাতে লেখা, আর কারো লেখা অত খারাপ হতে পারে না। ঝাঁকড়া চুল, ছেঁড়া সরু পেন্টেলুন পরা যে ছোকরা টেলিগ্রাফ এনেছিল, সে পানুর বাবাকে বুঝিয়ে বলল, এইভাবেই নাকি ইলশেঘাইয়ের সব তার পাঠানো হয়, তাতে খরচা একটু বেশী পড়লেও, তাড়াতাড়ি আসে। বাস-ভাড়া দু টাকা আর টিপিন এক টাকা দিলেই ও ফিরে যাবে। জবাব থাকলে ওর হাতে পাঠানো যায়, যার টেলিগ্রাপ্ তার কাছ থেকে সে-খরচা আদায় হবে, এইরকমই ওদের নিয়ম।

পানু কিছু বলবার আগেই হাতে-হাতে তিনটাকা দিয়ে বাবা ছেলেটাকে ভাগিয়ে দিলেন।

সেজকাকা চটে গেলেন, "ব্যাটার চোখ-দুটো দেখেছিলে? নাকের কাছ ঘেঁষে বসানো। কানের লতি জোড়া। আর তার হাতেই কিনা তিনটে টাকা দিয়ে দিলে।"

বাবা তো অবাক! "তাতে কী হয়েছে?"

"দুষ্কৃতকারীদের ওরকম হয়।"

পানু বলল, "দাদুর তো কানের তলা জোড়া, দাদু কি—"

বাবা ধমক দিলেন, "থাম্ দিকি। তা চাঁদু এখানে টেলিগ্রাফ পাঠাল কেন, নিজের ভাগ্নে গুপিকে না পাঠিয়ে?"

"ইয়ে—মানে—বোধ হয় কোনো বিপদে পড়েছেন, বাবা, কাল থেকে ছুটি আরম্ভ, আমরা যাব তো?"

বাবা ঐসবই ভালোবাসেন, বললেন, "তা যেতে পার, তবে একা-একা ঘুরবে না, তেলেভাজা খাবে না, চাঁদুর সঙ্গে থাকবে।"

শুনে বড় মাসটার ফিক্ করে হেসে ফেললেন। "তা থাকবেই তো, নইলে চাঁদুবাবুকে কে আরশুলার হাত থেকে রক্ষা করবে?"

বাবা অবাক হয়ে তাকাতেই, হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গিয়ে বললেন, "মানে কে কাকে দেখে তার ঠিক নেই। আমিও যেতাম, কিন্তু আমার এই কাঠের ঠ্যাংটা একটু মেরামত

করে না-নিলেই নয়। ও জায়গা আমার চেনা। ভারী ইন-টারেস্টিং জায়গা, তিনশো বছরের পুরনো ঘরবাড়ি, ইংরেজরা এখানে আসবার বহু আগে ওখানে পর্তুগীজ জলদস্যুদের আস্তানা ছিল। এখনো নাকি মাঝে মাঝে তাদের লুকোনো সোনাদানা বেরিয়ে পড়ে। বজবজ ছাড়িয়ে মাইল পনেরো যেতে হয়। বাস্ যায়। বড় বড় গাছ, ফাঁকে ফাঁকে বিশাল সব কাকের চোখের মতো টলটলে-জলে-ভরা পুকুর, তার নীচে মাছ কিলবিল করতে দেখা যায়—দেখবি সব।"

পানুকে কিছুই করতে হল না, বাবাই গুপিদের বাড়ি গিয়ে খুদে ব্যাগ সহ গুপিকে সঙ্গে নিয়ে রাতে ফিরলেন। রামকানাইদা চেতল মাছের বড়া করেছিল. গুপিকে পায় কে।

পরদিন যখন ইলশেঘাইতে দুজনে বাস্ থেকে নামল তখন বেলা একটা হলেও চারদিক কেমন থমথম করছিল জায়গাটার নাকি বড্ড বদনাম। নাকি একটাও সংলোক বাস করে না। বড় মাস্টারের কথা। দুপুরের খাবার পানুর মা সঙ্গে দিয়েছিলেন, একটা বটগাছের নীচে বসে তার সদ্ব্যবহার করা হল। মুখে একটা মাংসের বড়া পুরে গুপি পানুকে কনুইয়ের গুঁতো দিয়ে বলল, "সয়ু পেণ্টেলুন বাস্ থেকে নেমে অবধি আমাদের ফলো করছে।"

পানু ফিরে দেখে সেই কানের লতি-জোড়া ছেলেটা ছাড়া আর-কেউ নয়। চোখাচোখি হতেই ফিক করে হেসে বলল, "একটু চলবে নাকি, ছোটকত্তা, কদ্দিন এ-গন্ধ নাকে ঢোকেনি! তোমাদের নিতে এসেছি।"

তিনজনে মিলে বেশ সাঁটাল। ছেলেটা আস্ত একটা গল্পের ঝুড়ি। এ-সব গাছ নাকি তিনশো বছরের বেশী পুরনো! এদের ডালে-ডালে রহস্য। পুকুর ছেঁচলে যা বেরুবে তা দেখলে নাকি পানুদের পিলে চমকে যাবে। এখানে কেউ সাধারণ লাঠি নিয়ে চলে না. সব গুপ্তি ভিতরে ছোরা গোঁজা। কেউ কাজকর্ম করে না, অথচ সকলের অবস্থা ভালো. মানে অবস্থা ভালো না হলেও—কী বলে ইয়ে—কাজ করবে কেন, অন্য উপায়ে যদি টাকা-কড়ি আসে। এবার উঠতে হয়. নইলে খ্যাংরাবাবুর নাড়ি ছেড়ে যাবে। খ্যাংরাবাবু যে ছোটমামা, তা আর বলতে হল না।

গঙ্গার ধারে উঁচু পাড়ির ওপর হয়তো-চারশো-বছ-রের-পুরনো একটা কেল্লামতো বাড়িতে ওদের নিয়ে গেল ছেলেটা। এটাই নাকি এখানকার জমিদারের বাড়ি ছিল, তাঁর প্রবল প্রতাপে বাঘে গোরুতে এক ঘাটে জল খেত। তারও আগে এটা সান পিদ্রো নামের বিখ্যাত জলদস্যুর আস্তানা ছিল, এর তলাকার পাথর নাকি চোরা-কুঠরি দিয়ে মৌচাকের মতো ঝাঁঝরা হয়ে আছে। "এখানকার বাবুরা একটা-একটা করে খুদে-খুদে ইঁট সরিয়ে সেই চোরা-কুঠরির ঢুকবার পথ খুঁজে বেড়াচ্ছেন. তাতে নাকি গাদা-গাদা সোনা ঠাসা। টিকটিকিবাবুকে তাই আনা হয়েছে, শুঁকে শুঁকে বের করে দেবেন। তা আজ পাঁচ দিন চার বেলা লুচি-পাঁঠা-কচুরি-সন্দেশ ওড়াচ্ছেন, চোরা-কুঠরি খুঁজে বের করা দূরে থাকুক, সব সময় নিজের ঘরটাই ঠাওর করতে পারেন না। পরশু ভুলে বুড়ী ঠাকুমার ঘরে ঢুকে পড়াতে, তিনি কষে ধোলাই দিয়েছেন, তাই এখনো বাবু খুঁড়িয়ে হাঁটছেন। অবিশ্যি তোমরা যখন তাঁর নিজের লোক, এ-সব কথা তোমাদের বলা শোভা পায় না। ওটা কী পকেট থেকে বের করলে, ভাজা-মশলা নাকি?"

ব্যাপার বুঝে পানু-গুপি হাঁ! চাঁদুবাবু হলেন গুপির ছোটমামা, বর্ধমানের সমাদ্দার ইনভেস্টিগেশন্সে দুই বছর শিক্ষানবিশি করলে, পুলিশের দুঁদে গোয়েন্দা বিনু তালুকদার ওঁকে পুলিসের তদন্ত বিভাগের পরী-ক্ষায় একটা চান্স দেবেন. ছোটমামা সেই আশাতেই আছেন। এদিকে সমাদ্দারের আপিসের সব চাইতে ঘোরেল তদন্ত বড়সাহেব ছোটমামার ওপর চাপিয়ে দেন। ছোটমামার ছোটবেলায় একবার অম্বলের ব্যামো হয়েছিল, সেই ইস্তক যখন-তখন বিপদে পড়লে হাতে পায়ে খিল ধরে, ভালো-ভালো খাবার না খেলে গায়ে জোর পান না। তাই শেষ পর্যন্ত গুপি-পানুকে না ডেকে উপায় থাকে না। তাদের দুজনেরই চোদ্দ বছর বয়স, ভয়ঙ্কর সাহস আর এই-এই পায়ের গোছ!

কেল্লার চারদিকে খাল কাটা, আগে তাতে কুমির হাঙর কিলবিল করত, তার ওপর পুল বসানো, সেই পুলটা ওপার থেকে কপিকল দিয়ে তুলে ফেলা যায়। মানে আগে যেত, শিকল মেরামত করে, যন্তরে তেল ঢেলে. আট-দশজন জোয়ান যদি হাতল ঘোরায় তো এখনো হয়ত যেতে পারে। আপাতত পুল নামানো, নীচের খাল খটখটে শুকনো, তাতে আলু পেঁয়াজের বাগিচা করা হয়েছে। সরু-ঠ্যাং বলল, সে-সব আর কাউকে খেতে হয় না, রাতে দলে দলে বুনো খরগোশ এসে সব সাবাড় করে দেয়। অবিশ্যি গুলতি দিয়ে বুনো খরগোশ মারা যায়, খেতে খুবই ভালো, তবে বেজায় হিংস্র, কামড়ে-টামড়ে দেয়। বড়কর্তারা তাই কুকুর বেচে দিয়েছেন, খর-গোশের ভয়ে কেউ সন্ধ্যার পর এ-জায়গার ত্রিসীমানায় পা দেয় না।

গুপি পানু অবাক হয়ে বলল, "তাতে টিকটিকি-বাবুর তদন্তের অসুবিধা হয় না?" হ্যা-হ্যা করে খানিকটা হেসে ছোকরা বলল, "কিসের অসুবিধা? ওনার তদন্ত তো কেল্লার মধ্যিখানে, তলায়-ও বলতে পার। বরং সুবিধাই হয়েছে, খরগোশের ভয়ে উনি রেতে পেলিয়ে যেতে পারেন না। জানলা দিয়ে আমাকে বহাল করেছেন তোমাদের নিয়ে আসবার জন্য. বলেছেন তোমরা আমাকে যথেষ্ট খুশী করে দেবে। তোমাদেরও অনেক কাজে লাগতে পারি, রেতে এদিকেই থাকি, শহরে খরগোশের মাংস সরবরাহ করি কিনা—"

গুপি বলল, "কলকাতায়? কোন বাজারে বল তো?"

সরুঠ্যাং হাসল, "ওমা! কলকেতা আবার কোথা পেলে? সে তো বলতে গেলে বোম্বাইয়ের কাছে, শহর বলতে আমরা বুঝি বজবজ সে-ও কিছু কলকেতার চেয়ে কম বড় নয়, তার ওপর অনেক বেশী পুরনো-ও বটেক। এই যে এসে গেলাম, ঘন্টির ছিকলি টানো। আমার পুল পেরুতে মানা।"

চার-মানুষ উঁচু দেয়াল, ফটকটাও কম করে দশ ফুট তো হবেই, মোটা কাঁঠাল-কাঠের ওপর লোহার পাত দিয়ে মোড়া, নিশ্চয় সেই সান পিদ্রোই বানিয়েছিল। তবে শেকল টানতে হল না, ফটকের গায়ে ফাটা একটা খুদে দরজা খোলাই ছিল, ভিতরের উঠোনে ছোটমামা ব্যস্তসমস্ত-ভাবে পাইচারি করছিলেন। ওদের দেখে ছুটে এসে বল-লেন, "ঐ চোঙা মতো জিনিসটার মধ্যেই ঘোরানো সিঁড়ি আছে, তাই বেয়ে একেবারে ছাদের চুড়োর ঘরে গিয়ে বোস্, আমি এই চিংড়িমাছের ঝাল-ফিরেজিটা নামিয়ে

এক্ষুনি আসছি, ধরে গেলেই কেলেঙ্কারি! কিন্তু দেখিস তোরা এসেছিস কেউ যেন টের না পায়।"

গুপি অবাক হয়ে বলল, "সে কী, তুমি কি এদের বাবুর্চি বনে গেলে নাকি? তাহলে সমাদ্দারের তদন্তটা কে করবে শুনি?"

ছোটমামা মুচকি হাসলেন, "বাবুর্চি ছাড়া আবার কে? এখানকার গলিঘুঁজি সে জানবে না তো কি আমি জানব? এখানে জন্মেছিল, ওর আগে ওর বাবা বাবুর্চি ছিল, তার আগে তার বাবা, তিন-চারশো বছর আগে সান-পিদ্রোর মুর্গ মুশল্লম ওর অতিবড়-প্রপিতামহ রাঁধত। কিন্তু এ-ব্যাটার রান্না মুখে তোলা যায় না, অগত্যা আর কী করা। যাই হোক, এখন তোরা যখন এসে পড়েছিস—এই রে!"

বাবুর্চিখানা থেকেই বোধ হয় ছ্যাঁক-ছ্যাঁক শব্দ বেরুতেই ছোটমামা সেই চোঙামতো জিনিসটার পাশের একটা নিচু দরজা দিয়ে ছুটে ঢুকে গেলেন। গুপিরাও চোঙায় ঢুকে, আগাগোড়া পাথরের ঘোরানো সিঁড়ি বেয়ে একেবারে চারতলার ছাদের ওপরে চুড়োর নীচেকার গোল ঘরে উপস্থিত হল। অমনি মুখে ঝিরঝির করে এক ঝলক সমুদ্রের হাওয়া লাগল। প্রাণ জুড়িয়ে গেল।

তখন হয়তো বেলা চারটে, এ সময় কেউ যে চিংড়ি মাছের ঝাল-ফ্রিজি রাঁধে, পানুর সেটা জানা ছিল না। গুপি বলল, "আচ্ছা, ইলেকট্রিক লাইট নেই, তেলের বাতি জেলে ছোটমামা রাঁধল আর কী! শেষটা যদি কিলু-বিলেরা উড়ে আসে!"

ঘরে একটা প্রকাণ্ড কারিকুরি করা সেগুনকাঠের তক্তাপোষ, তিনটে হাল্‌কা নেয়ারের খাট আর একটা কাঠের নিচু টেবিল ছাড়া কোনো আসবাব ছিল না। দেয়ালে অনেক কুলুঙ্গি, মস্ত মস্ত জানলা, তারি একটাতে মান্ধাতার আমলের এক দূরবীন বসানো। নেয়ারের খাটে দিব্যি বিছানা পাতা। তার ওপর ঝপাঝপ শুয়ে পড়ে ওরা বলল, আঃ! কী আরাম!

শুয়ে শুয়ে জানলা দিয়ে চেয়ে দেখে নদী তো নয় যেন সাগর, ওপার দেখা যায় না। পাথরের খাঁড়ির নীচে জোয়ারের জল আছড়ে পড়ে অদ্ভুত এক শব্দ বেরুচ্ছে, যেন বিকট একটা ড্রাগন রাগে ফুসছে! "এই ঘরে ছোট-মামা একা শুত! আশ্চর্য!" গুপি বলল, "না শুয়ে করে কী, বাইরে তো হিংস্র খরগোশের পাল আলুগাছ চিবুচ্ছে! তবে একা নিশ্চয় শুত না। বাবুর্চিকে আনাত, পরদিনের মেনু ঠিক করত।"

এর মধ্যে ছোটমামা ঘরে ঢুকে বললেন, "হাসছিস যে বড়? জানিস্ এ-বাড়িতে চারশো বছর কেউ হাসেনি।" তারপর নিজের হাঁটু চাপড়ে বললেন, "পুরো পাঁচ দিন ধরে হয়রান হয়ে গেলাম, মাটির তলায় মৌচাকের মতো চোরা কুঠরি, অথচ তার একটা ঢুকবার রাস্তা পাওয়া যাচ্ছে না!"

পানু বলল, "আমি পেয়েছি। কিন্তু খিদেও পেয়েছে, চা জলখাবার কোথায়?" সে কথার উত্তর না-দিয়ে ছোট-মামা লাফিয়ে উঠলেন, "অ্যাঁ! পেইছিস নাকি? কোথায়?"

জানলার কাছে গিয়ে পানু নীচে পাথরের ঢিপির দিকে দেখাল, "এই দূরবীন দিয়ে দেখ। ঐ যে কচ্ছপের মতো দেখতে পাথরটার পিছনে, ওটা একটা গুহার মুখ না? ঐ না হয়ে যায় না।" দেখে ছোটমামার মুখ পাংশু-পানা।

"কিন্তু—কিন্তু—ওখানে যাওয়া হবে কী করে?"

গুপি বলল, "কেন? দিনের বেলায় যেতে দোষ কী? খরগোশরা তো রাতে আসে।"

ছোটমামা বিরক্ত হয়ে ওর দিকে একবার তাকিয়ে বললেন, "ঐ পাথর বেয়ে তো নামা যাবে না।" পানু বলল, "দুষ্কৃতকারী নদী থেকে বামাল ঐ পথে ঢুকে চোরা কুঠরিতে লুটের মাল রাখত। এ-দিক থেকেও যাবার একটা পথ নিশ্চয় আছে, সেইটেই বের করতে হবে। ওরা নিশ্চয় প্রকাশ্যে বাইরে দিয়ে যাওয়া-আসা করত না, তাহলে নবাবের সৈনিকরা আর ওদের আস্ত রাখত না।"

ছোটমামা অবাক হয়ে গেলেন, "নবাব? কোনো নবাবের কথা তো শুনিনি। তবে বিনু তালুকদারের বিশ্বাস বোম্বেটেদের সেনা-টেনা বাজে কথা, এর ভিতরে নিশ্চয় বে-আইনী সোনা পাচারের ষড়যন্ত্র আছে। দলে ভাঙন ধরেছে, এক দল লুকিয়েছে, একদল হন্যে হয়ে খুঁজছে, তারাই সমাদ্দার ইনভেস্টিগেশন্সের শরণাপন্ন হয়েছে। স্যারকে আগে থাকতেই এক হাজার টাকা দিয়েছে, সে তো আর চাট্টিখানিক কথা নয়। এদিকে—"

এই বলে বেজার মুখ করে ছোটমামা বসে রইলেন। চা-জলখাবারের কথা কিছু বললেন না। শেষটা পানু আরেকবার সে-কথা তুলতেই, তেড়িয়া হয়ে উঠে বললেন, "কেন, তোদের মায়েরা এদ্দুর ছেলে পাঠিয়েছে, সঙ্গে জলখাবার দেয়নি?"

গুপি রেগেমেগে পোঁটলা খুলে আলু-ফুলকপির সিঙাড়া আর নারকেল-নাড়ু বের করে বলল, "দিয়েছে, তবে তোমার জন্য নয়।" এই বলে পানুর হাতে দুচারটে দিয়ে, নিজে খেতে আরম্ভ করল।

ছোটমামা বললেন, "ঐ দেখ, অমনি চটে গেল! আরে তোরা কি ঠাট্টাও বুঝিস না? তাছাড়া এই অসময়ে খাবারদাবার বের করতে গেলে জানাজানি হয়ে যাবে। বাইরের লোকের ঐ পুল পেরুনো. মানা, কেউ ঢুকলে তাকে ডালকুত্তো দিয়ে খাওয়ানো হয়—"

"খরগোশ দিয়ে খাওয়ানো হয় বল, কুকুর-ফুকুর নেই। বাড়িটাতে ভালো করে খানা-তল্লাসি করেছ কি? রান্না-ঘরের উনুনের নীচে, শোবার ঘরের খাটের তলায় চোরা দরজা থাকতে পারে।"

ফোঁশ্ করে একটা শব্দ করে ছোটমামা বললেন, "সব, দেখা হয়েছে। দুই কর্তার পেয়ারের খানসামাদের, বুড়ীঠাকুমার আর তাঁর বৌমাদের খাস-দাসীদের প্রত্যেককে যথাসাধ্য ঘুষ দিয়ে খুঁজতে আর-কিছু বাকী রাখিনি। কিচ্ছু পাইনি, মাঝখান থেকে আমার ঠ্যাংটা—"

এই বলে ছোটমামা বাঁ হাঁটুতে হাত বুলুতে লাগ-লেন। পানু তাঁকে সিঙাড়া নারকেল-নাড়ু খাওয়ালে পর তবে একটু সুস্থ হলেন।

স্থির হল, ওসব কোনো কাজের কথা নয়, চোরা দরজা একতলার কোনো অপ্রত্যাশিত অথচ সহজে নাগাল পাওয়া যায়, এমন জায়গায় হবে। রাতে তদন্ত করতে হবে, বাড়ির মধ্যে তো আর খরগোশ নেই, ছোট-মামার অত ভয়টা কিসের?

ধরা পড়ার ভয়ে ঐ ঘরে ওরা সারাদিন আটক রইল, ছাদে আর অন্য ঘর ছিল না। বাড়িতেও খুব বেশী লোক আছে মনে হল না। এককালের বড়লোক হতে পারে, এখন তাঁদের অবস্থা যে পড়ে গেছে সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। তবু নাকি দুবেলা চর্ব্যচোষ্য খাওয়া চাই

বাড়ির যত ভালোভালো আসবাব, কাঁসার বাসন, ঝাড়-বাতি বেচে বেচে ও'রা কোর্মা-কাবাব খান, পেস্তা দিয়ে ক্ষীর হয় রোজ। পায়ের নীচে যাদের সোনার পাহাড়, তাদের এর চাইতে বেশী দুর্দশা কী হতে পারে! আজ-কাল নাকি ছোটমামাকে বড়কর্তা মেজকর্তা চোখা চোখা কথা শোনাতে শুরু করেছেন। বুড়িঠাকুমা বে'টে একটা মুগুর এনে রেখেছেন। ভাগ্যিস একতলায় কেউ নামেন না, তাই রান্নাঘরের অদল-বদল ব্যবস্থার কথা কেউ জানেন না। এদিকে কাল থেকে বাবুর্চির দেখা নেই, চোরা দরজা খ'ুজে পেয়ে, তাই দিয়ে নেমে কোনো নতুন বিপদে পড়ল কি না তাই বা কে জানে! ছোটমামা ঘনঘন কপালের ঘাম মুছে, রাতের জন্য বাকরখানি বানাতে নীচে নেমে গেলেন। হরেকেষ্ট বলে একটা লোক সর্বদা রান্নাঘর আগলায়, নইলে ছোটমামার গা-শিরশির করে। নালা দিয়ে নাকি জিব-চেরা চার ফুট লম্বা গো-সাপ আনাগোনা করে।

অনেক রাতে কর্তাদের দোতলা-তিনতলার ঘর চুপ-চাপ হয়ে গেলে, ওদের দুজনের জন্য সে কী ভালো খাবার নিয়ে এলেন ছোটমামা, গুপি বলল, "পুলিসে না ঢুকে, তুমি অশোকা হোটেলে ঢুকলে পার, ছোটমামা। এমন রান্না কেউ কখনো রাঁধেওনি, খায়ওনি। প্রকৃতির দেওয়া গুণ নষ্ট করতে হয় না।" ছোটমামাও রান্নাঘরের শিকলি তুলে ওদের সঙ্গে খেতে বসলেন। পাশের স্নানের ঘরে তোলা জলে বাসন ধোয়া হল। পানুরা প্ল্যাস্টিকের থালা গেলাস এনেছিল। তারপর টর্চ নিয়ে সবাই নীচে নেমে এল। রবারের জুতোয় এতটুকু শব্দ হল না।

সমস্ত একতলাটাকে গোরুখোঁজা করে ফেলা হল। স্রেফ একটি গোলকধাধা! এখানে একটা গলি বাঁক নিয়েছে, ওখানে দুটো সি'ড়ি, সেখানে একটা ঘুপচি খোপ, তাতে ঘু'টে রাখা হয়েছে। ঘোরানো সি'ড়ি মাটি ফু'ড়ে নীচে নেমে গেছে। সেখানে সারিসারি কুঠরিতে পর্তুগীজরা তাদের রসদ মজুত রাখত। বড় বড় পিপে, মস্ত মস্ত পাথরের হাঁড়া, তাতে বৃষ্টির জল ধরে রাখা হত। ছাদে বড় বড় আংটা, আঁকড়া, দেয়ালে লোহার তাক। ছোটমামা বললেন, "এর প্রতিটি বর্গ-ইঞ্চি হাতুড়ি ঠুকে দেখা হয়েছে, কোথাও এতটুকু ফোঁপরা আওয়াজ নেই।"

অদ্ভুত সব শব্দ কানে আসছিল, বগবগ করে কোনো জায়গা থেকে জলের আওয়াজ শোনা যাচ্ছিল, নিশ্চয় গঙ্গার প্রচণ্ড জোয়ারের জল, অথচ তার সঙ্গে কোথাও কোনো যোগাযোগ নেই, সব শূন্য খাঁ-খাঁ করছে। শুধু এক জায়গায় বুড়ী ঠাকুমার তৈরি সারি-সারি লঙ্কার আচার রয়েছে, সে নাকি এমনি ঝাল যে, যে-কোনো দিন বোয়ম ফেটে পাথরের দেয়ালে আগুন লেগে যেতে পারে! সে যাই হোক, এখান থেকে যে বেরুবার পথ নেই, সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

ছোটমামা বললেন, "থাকবেই বা কেন? বোম্বেটেরা তো দুর্ধর্ষ ডাকাত ছিল, তারা যাতে বাড়ির মধ্যে সেঁদুতে পারে, এমন কোনো পথ নিশ্চয়ই রাখা হয়নি।"

শেষ পর্যন্ত হতাশ হয়ে ওরা আবার রান্নাঘরের সামনের চাতালে গিয়ে বসল। গুপি সন্দেহেতে দোতলা-তিনতলার জানলার দিকে তাকাল। খুদে ঘুলঘুলির মতো এদিকের জানলা, মাটি থেকে অনেক উপরে, আল-মারির মাথায় না চাপলে পৌ'ছনোই যাবে না। ছোটমামা

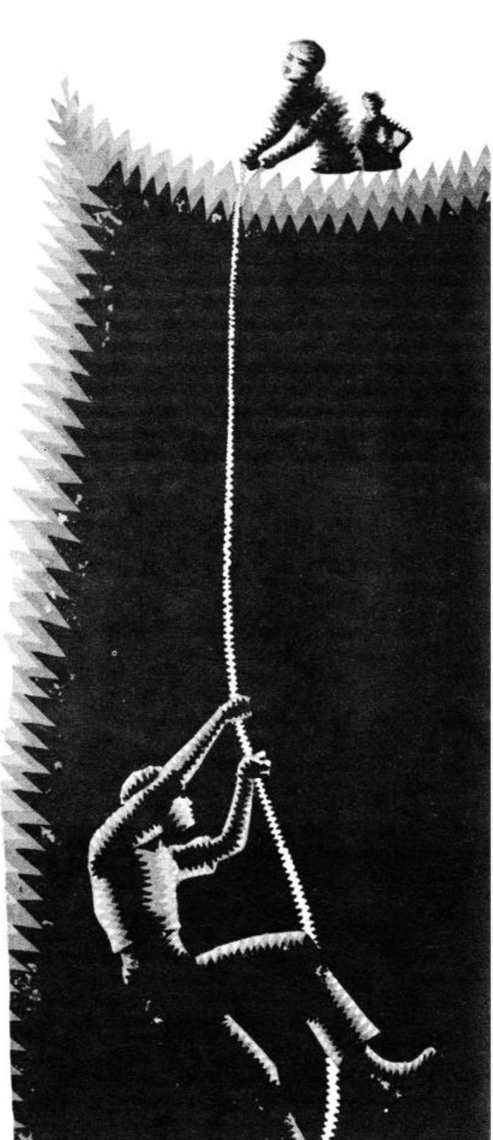

বললেন, "ও কী? অত সন্দ কিসের? কর্তাবাবুদের খাবার সময় বলে রেখেছি যে, কিছু কিছু হদিশ পেইছি বলে দুজন শাকরেদ আনাচ্ছি। ও'রা মত দিয়েছেন, তবে এই

শর্তে যে কাল সকালের মধ্যে সোনা বের করে দিতে হবে—ই-ই-ক্!"

তারার আলোয় দেখা গেল, এই লম্বা একটা গোসাপ ছোটমামার গা ঘেঁষে, উঠোনের দেয়ালের কাছেকার খাবার জলের ন্যাড়া কুয়োর মধ্যে দিব্যি নেমে গেল। আর সঙ্গে সঙ্গে কুয়োর মধ্যে থেকে বিশ্রী একটা ও'য়া-ও'য়া শব্দ বেরুতে লাগল! ছোটমামা সঙ্গে সঙ্গে "ব-ভূত! ব-ভূত!" বলে হাত-পা এলিয়ে মূর্ছো গেলেন। অথচ বিনু তালুকদার একশোবার ভূতে বিশ্বাস করতে মানা করেছেন। পানুদের সঙ্গে সর্বদা দড়ি, মগ্, এসব থাকত। পানু এক দৌড়ে ন্যাড়া কুয়োতে দড়ি-বাঁধা মগ নামিয়ে দিল। সঙ্গে সঙ্গে রে-রে-রে করে বেঁটে মুগুর হাতে চুল-ছাঁটা থানপরা বুড়ী ঠাকুমা ওর দিকে ধাওয়া করলেন। অমনি পানুও কুয়োর মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল! আর বুড়ী ঠাকুমা থমকে দাঁড়িয়ে, মুহূর্তের মধ্যে ঘুরপাক খেয়ে, দেয়ালে ঠেস দিয়ে ঠক-ঠক করে কাঁপতে লাগলেন।

অগত্যা গুপি কুয়ো থেকে জলতোলার মোটা দড়ির এক মাথা থাম্বাতে বেঁধে, অন্য মাথা হাতে নিয়ে কুয়োর কিনারা দিয়ে উঁকি মারতেই, সেই গোসাপটা দিব্যি সুন্দর টিকটিকির মতো বেরিয়ে এসে বুড়ী-ঠাকুমা আর ছোটমামাকে মাড়িয়ে টাড়িয়ে রান্নাঘরের বড় নর্দমার মধ্যে ঢুকে গেল। ওঁদের দুজনার মূর্ছোভাবও অমনি কেটে গেল। তবে এসব কিছুই গুপি দেখতে পায়নি।

গুপি হাতে টর্চ নিয়ে, সযত্নে কুয়োর মধ্যে আলো ফেলেই চমকে উঠল! হাত দশেক নীচেই কুয়ো সরু হয়ে গেছে চারদিক ঘুরে একটা হাত-দুই চওড়া কার্নিশের মতো বেরিয়ে এসেছে, আর তার ওপর পানু বসে মগ ঝুলিয়ে জল তুলতে চেষ্টা করছে। গুপি ডেকে বলল, "দরকার নেই, মূর্ছো ভেঙে গেছে!" আর অমনি কুয়োর ভিতর থেকে সেই বিশ্রী ও'য়া-ও'য়া শব্দ উঠতে লাগল। প্রতিধ্বনি ছাড়া কিছু নয়, কিন্তু পানু আরেকটু হলে পড়েই যায় আর কী! কার্নিশের কানায় কোনোমতে নিজেকে সামলে নিয়ে বিকট চ্যাঁচাতে লাগল, "আমাকে তোল্, শীগ্গির তোল্।"

দড়ির মাথায় ফাঁস দিয়ে পানুকে তুলতে খুব কষ্ট হল না। বুড়ী ঠাকুমা হাত লাগালেন! পেল্লায় জোর তাঁর গায়ে।

উপরে উঠে হাঁপাতে হাঁপাতে পানু বলল, "পেয়েছি!"

ঠাকুমা আঁতকে উঠলেন, "কী? কী পেইছিস্ রে ড্যাক্‌রা?"

"সোনার তাল!"

"অ্যাঁ! কোথায়? শীগ্গির বল্ কোথায়!"

পানু বলল, "কুয়োর দেয়ালের খাঁজে। আমার পা লেগে খাঁজের মুখের পাথর খুলে পড়ে গেছে। তার পাশ দিয়ে সুড়ঙ্গ বেরিয়ে গেছে দেখলাম, সিঁড়ি নেমে গেছে!"

শুনেই ঠাকুমা লাফিয়ে উঠলেন, "অ্যাই! অ্যাই তবে ঘাটে নামার পথ! এরা বলে কিনা গঙ্গাচান করতে হলে ফটক দিয়ে বেরিয়ে টাঙ্গা ভাড়া করে যেতে হবে! অথচ একেবারে উঠোনের মধ্যিখানে পথ! সর তোরা, আমি নামব! বলে গঙ্গাতীরে পঞ্চাশ বছর বাস করলাম, আর একবারো গঙ্গাচান করলাম না!" বলে হুড়মুড় করে নেমে পড়েন আর কী!

এমন সময় ফটকের বাইরে ত্রাহি ত্রাহি চিৎকার, "বাপরে মারে! এই কামড়ালে! এই খেলে রে! ওরে বাপরে! মরে গেলুম রে!" ছোটমামা উঠিপড়ি করে ফটকের মাঝখানের ছোট দরজা খুলে দিলেন, পড়িমরি করে জনাদশেক পুলিসের লোক আর তাদের পিছন-পিছন হুড়মুড় করে গোটা পাঁচেক খরগোশ হালুম হালুম করতে করতে ঢুকে পড়ল! ততক্ষণে বড়কর্তা ছোটকর্তা, দুই গিন্নীমা, হরেকেষ্ট, গিন্নিমায়দের খাস-দাসীরা, কর্তাদের পেয়ারের বেয়ারারা সব এসে জুটে-ছিল। দেখতে দেখতে খরগোশের দফারফা, রাতে ভোজ, ছোটমামা প্রধান বাবুর্চি। প্রধান আবার কী, বলতে গেলে একমাত্র বাবুর্চি। কারণ আসল বাবুর্চিকে টাকাকড়ি দিয়ে একমাসের ছুটিতে বজবজ পাঠিয়ে, যে-লোকটা বাবুর্চির পদে বহাল থেকে, ছোটমামার হয়ে তদন্ত করত, সে বিনু তালুকদারের লোক ছাড়া আর কেউ নয়। সে-ই থানায় রিপোর্ট করতে গেছিল। হরেকেষ্টও একজন পেয়াদা, তবে দীর্ঘকাল এখানে ওখানে রান্নাঘরের চাকর সেজে থেকে-থেকে, তার আজকাল রান্নার শখ চেপে গেছে, পুলিসের কাজ ভালো লাগে না!

আর সোনার তাল? সে-সব নাকি কর্তাবাবুদের বাবার পৈতৃক সম্পত্তি, বুড়ো-কর্তার উইলমত বুড়ী ঠাকুমা আর কর্তারা সমান-সমান ভাগ পাবেন। বিনু তালুকদারের লোকগুলো মহা হতাশ। "আরে মশাই, দুষ্কৃতকারী ধরা আমাদের কাজ, দুষ্কৃতকারী না থাকলে আমরা হতাশ হই! এঁরা বলছেন নাকি ট্যাক্স-ফ্যাক্স যা দেবার সব দেবেন। ধেত্তেরি ছাই!"

এরও অনেক পরে, যখন ওরা বাসে করে কলকাতায় পৌঁছে, পানুদের দোতলার ঘরে বসে রামকানাইদার তৈরি পাঁঠার ঘুগ্‌নি খাচ্ছিল, তখন ছোটমামা পকেট থেকে দুটো গত বছরের ফার্স্ট ডে কভার বের করে বললেন, "আমার একটু খট্‌কা লাগছে যে সেই বুড়ো কর্তা মারাই গেছেন পঞ্চাশ বছর আগে, তাঁর সোনার সঙ্গে এগুলো এল কী করে? তবে কি—!"

পানু কাষ্ঠ হেসে বলল, "তবে কি আবার কিসের? ঐ কুয়োর খোপে সোনার তালের নীচে ওগুলো ছিল। আরেকটাও ছিল। বোধ হয় কেউ দেখতে পান নি, সেটা আমি বিনু তালুকদারের কাছে দিয়েছি। এবার খেল শুরু হল বলে!"

আরও অনেক দিন পরে বিনু তালুকদার পানুর পিঠ চাপড়ে বললেন, "বেজায় চালাক তো তুমি হে। ঐ সোনার তালটি হল গিয়ে কর্তাদের চোরা-কারবারের মাল। ওগুলো নিজেরা লুকিয়ে ফেলে, গোয়েন্দা লাগিয়ে খুঁজে বের করিয়ে, অজানা পৈতৃক সম্পত্তি বলে চালাবার তালে ছিলেন ওঁরা। এখন সব ফেঁসে গেল, সোনাগুলো গচ্ছা গেল, তবে ওঁরাই যে লুকিয়েছিলেন তার কোনো প্রমাণ না থাকাতে, ওঁরা নিজেরা পার পেয়ে যাবেন। নিতান্ত পথেও বসবেন না, ঐ সব জমিজমাতে নাকি কোনো দামী ধাতুর সন্ধান পাওয়া গেছে, তাই খনিবিভাগ থেকে ন্যায্য দামে সম্পত্তিটা কিনে নেওয়া হচ্ছে। বুড়ী ঠাকুমা প্রথমটা বেঁটে মুগুড় নিয়ে তেড়ে এসেছিলেন, তারপর সবটা বুঝিয়ে বলাতে বললেন, "ওমা, তাই নাকি? আমাকেও আবার টাকা দেবে নাকি? তবে রাম-কেষ্টপুরে গিয়ে গঙ্গার ওপর বোনপোর বাড়িতে থাকাতে আর বাধাটা কী? কবে থেকে বলছে ওরা।"

ছবি এঁকেছেন ॥ মদন সরকার

জেমসের মজার আসর

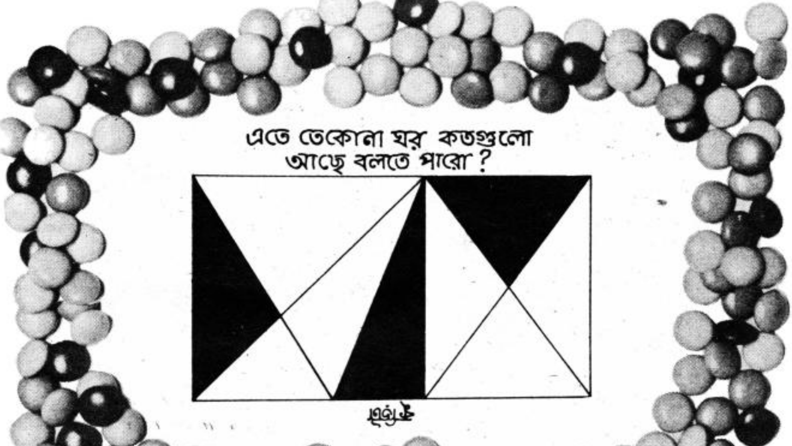

ছোটদের পছন্দসই
রঙবেরঙের
মিল্ক চকোলেট
জেমস্

ক্যাডবেরিস্
জেমস্ - খেতে ভারী মজা!

C-5 BEN

উপন্যাস

রাজা হওয়ার

আগে যা ঘটেছে

বোম্বাগড়ের মহারাজা কন্দর্পনারায়ণ বানপ্রস্থে যাবেন। যাবার আগে দুই ছেলে কীর্তিনারায়ণ আর কান্তিনারায়ণের মধ্যে তাঁর সমস্ত সম্পত্তি তিনি আধাআধি ভাগ করে দিয়ে যেতে চান। মরকত-মণিটিকে কেটে দু-ভাগ করা যায় না; তাই সেটিকে দেবেন এমন লোককে, যে সর্বশ্রেষ্ঠ নির্বোধ। আর শ্রেষ্ঠ নির্বোধকে যে খুঁজে বার করতে পারবে, সেই রাজপুত্রই বসবে সিংহাসনে। রাজা বানপ্রস্থে গেলেন, মন্ত্রীমশাই শূন্য-সিংহাসনে রাজমুকুট বসিয়ে রাজ্যশাসন করতে লাগলেন, আর দুই রাজপুত্র বার হলেন নির্বোধ খুঁজতে। ছ মাসের মধ্যে বোকা খুঁজে বার করা চাই। কিন্তু সারা রাজ্য ঢুঁড়েও তেমন বোকা পাওয়া যাচ্ছে না। তাই বনবাসী মহারাজার কাছে লোক পাঠানো হল। তিনি বললেন, বোম্বাগড়ে যদি বোকা খুঁজে না-ই পাওয়া যায়, তবে রাজপুত্রেরা বরং জম্বুদ্বীপে যাক। তা দুই রাজপুত্র সেই অনুযায়ী দুই জাহাজে করে জম্বুদ্বীপে গেলেন। ছোট রাজপুত্র কান্তিনারায়ণ ও তার ভৃত্য মধু সেখানে এক কলাওয়ালার দেখা পায়। বিনা-পয়সায় সে তার কলার কাঁদি বিলিয়ে দিতে চাইছে দেখে কান্তিনারায়ণ ভাবে, লোকটা ভারী বোকা। কিন্তু কলা নিয়ে তারা দু-চার পা এগোবার পরেই কলাওয়ালা কোতোয়ালকে বলে যে, তারা তার কলার কাঁদি চুরি করে পালাচ্ছে। বাস, কোতোয়ালও অমনি তাদের কয়েদখানায় পুরে দিল। ওদিকে, বড় রাজপুত্র কীর্তিনারায়ণও জম্বুদ্বীপে এসে বোকা খুঁজছিল। সেখানে, এক হাঁড়ি-কলসির দোকানের মালিক নিজেকে 'বোকা' বলে ঘোষণা করেছিল বটে, কিন্তু পরে দেখা গেল, সে অতি ধুরন্ধর ব্যক্তি। যে-হাঁড়ি সে বিক্রি করে, পরে লোক লাগিয়ে সেই হাঁড়ি ফাটিয়ে দেয়। সাক্ষীসাবুদ জুটিয়ে কীর্তিনারায়ণ তাই কোতোয়ালের কাছ চললে। তারপর—

॥ ৪ ॥

কোতোয়ালের থানা বেশী দূরের রাস্তা নয়। কিন্তু তারই মধ্যে রাস্তার লোকজন যখন সবাই দেখলে একদল লোক চলেছে থানার দিকে, তখন সবাই দলটার দিকে এগিয়ে এল। জিজ্ঞেস করলে, "কী হয়েছে গো? কী হয়েছে তোমাদের? কোথায় যাচ্ছো তোমরা?"

সবাই বললে, "কোতোয়ালের কাছে—"

"কোতোয়ালের কাছে কী করতে?"

সবাই তখন ব্যাপারটা খুলে বললে। শুনে অন্য লোকদের মুখগুলো কেমন গম্ভীর-গম্ভীর হয়ে গেল। কোথাকার কোন্ দেশের লোক, বিদেশ থেকে এসেছে, তার জন্যে এত দরদ কি ভালো? নিজের দেশের লোকের বিরুদ্ধে তোমরা সাক্ষ্য দিতে যাচ্ছো? তোমাদের লজ্জা করছে না? বিনোদ দাস যত খারাপ লোকই হোক, সে তো আমাদের নিজের দেশের লোকই বটে!

কথাটা খাঁটি। সবাই নিজেদের মধ্যে ভেবে দেখলে। তা ছাড়া আরো একটা কথা আছে। কোতোয়ালের কাছে সাক্ষী হওয়া মানে অনেক ঝামেলা। শেষকালে অনেক ঝামেলা পোয়াতে হবে তোমাদের। শেষকালে রাজ-দরবারে তোমাদের সাক্ষীর কাঠগড়ায় গিয়ে দাঁড়াতে হবে। তখন তোমাদের নামে সমন জারি হবে! তাই তোমাদের বলছি এমন কাজটি কোর না হে! ওতে অনেক ল্যাঠা।

কথাগুলো এক কান থেকে আর-এক কানে গিয়ে উঠলো। তারপর অন্য আর-একজনের কানে। দেখতে দেখতে ভিড় পাতলা হয়ে গেল। এক-একজন সরে পড়তে লাগলো নিঃশব্দে। কাজ নেই ঝঞ্ঝাটের মধ্যে গিয়ে। বেশ আছি বাবা, মাঝখান থেকে কেন বাজে ঝামেলায় পড়ি!

যখন কোতোয়ালির কাছাকাছি এসে গেছে তখন হঠাৎ খেয়াল হলো দাশরথির। চারদিকে দেখলে। পাশে পেছনে ডাইনে-বাঁয়ে কেউ নেই। কোথায় গেল সব তারা?

কান্তিনারায়ণও দেখলে। যারা তাদের গাছে তুলে দিলে তারাই কিনা শেষকালে মই কেড়ে নিলে। জম্বুদ্বীপের লোকেদের এ কেমন স্বভাব?

দাশরথি বড়-দাদাবাবুকে জিজ্ঞেস করলে, "এখন কী হবে আজ্ঞে? যারা আমাদের আনলে তারাই তো দেখছি পালিয়ে গেল!"

কান্তিও ভাবছিল তাই নিয়ে। এ কী রকম আজব দেশ? এ-দেশের এ কী রকম সব লোক। কেউ কারো বিপদে-আপদে সাহায্য করে না, আর সাহায্য করতে এলেও কাজের বেলায় সব অষ্টরম্ভা! এই কি জম্বুদ্বীপ নাকি? এই ধড়িবাজের দেশে কিনা তারা বোকা লোক খুঁজতে এসেছে!

কান্তিনারায়ণ বললে, "ঠিক আছে, যখন এতদূর এসেছি তখন আর পেছোব না। এস্‌পার-ওস্‌পার একটা কিছু হয়ে যাক। দেখি না এর শেষ কোথায়, কোথায় কত-দূর এই মামলা গড়ায়। কোতোয়াল তো আর আমাদের ফাঁসি দেবে না—"

দাশরথি এ-কথার পর আর কোনও আপত্তি করলে না। সঙ্গে সঙ্গে চলতে লাগলো।

কান্তিনারায়ণ বললে, "তোমার জন্যেই তো এই বিপদ হলো, নইলে তো হাঁড়ি কিনতেও হতো না, আর সেই হাঁড়ি ভেঙেও যেত না। তুমিই তো বললে বিনোদ দাস লোকটা বোকা। এখন দেখলে তো জম্বুদ্বীপের লোকগুলো কী-রকম শয়তান—"

কোতোয়ালির কাছে আসতেই বাইরে শান্ত্রী পথ আটকে দাঁড়ালো। জিজ্ঞেস করলে, "কী চাই তোমাদের?"

কান্তিনারায়ণ বললে, "আমরা কোতোয়ালের সঙ্গে দেখা করতে চাই।"

"কেন?"

কান্তিনারায়ণ বললে, "শহরের একজন হাঁড়ির দোকানের মালিক বিনোদ দাস আমাদের ঠকিয়েছে, তার বিরুদ্ধে আমরা কোতোয়ালের কাছে নালিশ পেশ করতে চাই—"

বিনোদ দাস! হাঁড়ির দোকানের মালিক।

শান্ত্রী সঙ্গে সঙ্গে একটা মতলব ভেঁজে নিলে। বললে, "নালিশ পেশ করবে? কোতোয়ালের কাছে? তাহলে দাঁড়াও, আমি ভেতরে গিয়ে কোতোয়ালের কাছ থেকে জিজ্ঞেস করে আসি, দেখে আসি কোতোয়াল

ঝকমারি

বিমল মিত্র

আছেন কি না, তোমরা এখানে একটু দাঁড়াও—"

বলে সেখানে তাদের দাঁড় করিয়ে রেখে ভেতরে চলে গেল।

কিন্তু অনেকক্ষণ সেইভাবে কেটে গেল, শান্ত্রী আর আসে না। সকাল গড়িয়ে দুপুর হতে চললো। তখন ক্ষিধে পেয়ে গেছে তাদের। আর কতক্ষণ তারা সেখানে দাঁড়িয়ে থাকবে! এ কী-রকম কোতোয়ালি আর এ কী-রকম কোতোয়াল। আর এই শান্ত্রীটাই বা কী-রকম লোক। সেই যে গেল তো গেলই, আর তার আসবার নামই নেই!

কিন্তু শান্ত্রী অত তাড়াতাড়ি আসবে কী করে? সে তখন কোতোয়ালির পেছনের দরজা দিয়ে একেবারে হন্-হন্ করে সোজা বিনোদ দাসের হাঁড়ির দোকানে গিয়ে হাজির!

বিনোদ দাস শান্ত্রীকে তার দোকানে আসতে দেখে অবাক!

জিজ্ঞেস করলে, "কী হে শান্ত্রীমশাই, তুমি আমার দোকানে কী করবে? হাঁড়ি কিনবে নাকি?"

শান্ত্রী বললে, "হাঁড়ি কিনতে আমার বয়ে গেছে তোমার নামে নালিশ আছে কোতোয়ালিতে! তুমি একজন লোককে হাঁড়ি বেচেছিলে বুঝি?"

বিনোদ দাস বললে, "হ্যাঁ, আমার তো হাঁড়িরই কারবার, হাঁড়িই তো আমি সবাইকে বিক্রি করি—"

"তারপর বুঝি আবার তোমার বাঁশ দিয়ে তার হাঁড়ি ফাটিয়ে দিয়েছিলে?"

বিনোদ দাস ভয় পেয়ে গেল। জিজ্ঞেস করলে, "কে বললে?"

শাস্ত্রী বললে, "বলবে আবার কে? যাদের হাঁড়ি ভেঙেছ সেই তারাই বললে। এখন কোতোয়ালের কানে সব কথা গেছে। কোতোয়াল তোমাকে গ্রেফতার করতে হুকুম দিচ্ছে। তুমি সবাইকে এমনি করে ঠকাবে আর ভেবেছ বরাবর পার পেয়ে যাবে? এখন ঠ্যালা সামলাও—আর তা ছাড়া তারা বিদেশী লোক, আমাদের দেশে বেড়াতে এসেছে, তুমি কিনা তাদের ঠকালে?"

কথাগুলো শুনে বিনোদ দাসের মুখ শুকিয়ে গেল।

বললে, "তাহলে কী করবো শাস্ত্রীমশাই? এখন আমার কী হবে?"

শাস্ত্রীমশাই বললে, "আমি তোমার জন্যে আগে অনেক কিছু করেছি, আগে অনেক বার তোমাকে জেল থেকে বাঁচিয়েছি, বার-বার এমন কাজ করলে আমি তোমাকে কাঁহাতক্ বাঁচাই বলো তো? আমারও তো চাকরির ভয় আছে। আমাকেও তো সংসার করতে হয়, আমারও তো ছেলে-মেয়ে-বউ আছে, তাদের কথাও তো আমাকে ভাবতে হয়! আমি তোমাকে বাঁচাতে পারবো না।"

বিনোদ দাস শাস্ত্রীমশাই-এর হাত দুটো নিজের দুই হাতে জড়িয়ে ধরলে।

বললে, "তুমি ভাই আমাকে যেমন করে পারো বাঁচাও। আমার নিজের ভাই নেই, তুমিই আমার আপন ভাই-এর মত। এবারের মত আমাকে বাঁচাতেই হবে ভাই। তুমি যা চাও আমি তাই-ই দেব-"

বলে আর কথা বাড়ালে না। ভেতর থেকে কয়েকটা টাকা নিয়ে এসে শাস্ত্রীমশাই-এর হাতে গুঁজে দিলে। বললে, "এই যা আছে আমার কাছে তোমায় দিলাম, আর আমার কাছে একটা কানা কড়িও নেই।"

শাস্ত্রীমশাই রেগে গেল। বললে, "তুমি আমাকে ঘুষ দিচ্ছ? আমি ঘুষ খাবো? তুমি আমাকে ঘুষ দিয়ে কাজ হাঁসিল করতে চাও? তুমি আমাকে এত নীচ মনে করো? আমি জীবনে কখনও কারো কাছ থেকে ঘুষ নিয়েছি যে তুমি আমাকে ঘুষ দিতে এসেছ?"

বিনোদ দাস লজ্জায় জিভ্ কাটলে।

বললে, "ছিঃ ছিঃ, আমি তোমাকে মিষ্টি খেতে টাকা দিলাম আর তুমি কিনা এটাকে ঘুষ বলছো?"

শাস্ত্রীমশাই বললে, "দু' টাকার মিষ্টি খাবো আমি? দু টাকার মিষ্টি খেয়ে আমার পেট ভরবে? আর তুমি কি মনে করো আমি নিজের বউ-ছেলে-মেয়েকে না খাইয়ে একলা মিষ্টি খাবো? আমি এত পেটুক?"

ইঙ্গিতটা বুঝতে পারলো বিনোদ দাস। তখন আর কথা বাড়ালো না। ভেতরের ঘর থেকে আরো দশটা টাকা নিয়ে এসে শাস্ত্রীমশাই-এর হাতে গুঁজে দিতে গেল।

শাস্ত্রীমশাই জিজ্ঞেস করলে, "কত দিচ্ছ? কত আছে ওতে শুনি?"

বিনোদ দাস বললে, "আরো দশটা টাকা দিলাম, ওইতেই কোনও রকমে চালিয়ে নাও তুমি। তোমার ছেলে-মেয়ে-বউ সকলকে মিষ্টি খাইও। ওর বেশী আমি পারবো না শাস্ত্রীমশাই—"

শাস্ত্রীমশাই পনেরোটা টাকা ছুঁড়ে ফেলে দিলে মেঝের ওপর। বললে, "আমি আর আমার পরিবার মিষ্টি খেলেই চলবে? আর আমার কোতোয়াল মশাই বুঝি বুড়ো আঙুল চুষবে? তাঁর বুঝি আর মিষ্টি খেতে ইচ্ছে করে না? তাঁর বুঝি আর ছেলে-মেয়ে-বউ কিছু নেই?"

তাও তো বটে। বিনোদ দাস ব্যাপারটা বুঝলে। তাড়াতাড়ি মেঝের ওপর থেকে টাকা ক'টা কুড়িয়ে নিয়ে ভেতরের ঘর থেকে আরও তিরিশটা টাকা নিয়ে এসে পুরো পঁয়তাল্লিশটা টাকা শাস্ত্রীমশাই-এর হাতে গুঁজে দিলে। বললে, "আর বেশী চাপ দিও না ভাই, আমি মারা যাবো, আমার কারবার লাটে উঠবে তাহলে—"

এতক্ষণে শাস্ত্রীমশাই-এর মেজাজ যেন একটু ঠাণ্ডা হলো। বললে, "ঠিক আছে, তুমি যখন এমন হাতে-পায়ে ধরছো তখন আর কী করি, আমি নিচ্ছি। কিন্তু এ-রকম করে আর বেশীদিন তোমাকে বাঁচাতে পারবো না দাস-মশাই। কোনও রকমে যদি রাজামশাইয়ের কানে যায় খবরটা তো তখন তুমিও মুশকিলে পড়বে, আমিও মুশকিলে পড়বো। এই বলে রাখলুম—"

বলে টাকাগুলো ট্যাঁকে গুঁজে নিয়ে শাস্ত্রীমশাই চলে গেল।

জম্বুদ্বীপের কোতোয়াল বড় হুঁশিয়ার লোক। এই কোতোয়ালগিরি করে বেশ বাড়ি-ঘর-দোর-জমি-জিরেত স্বনামে বেনামে অনেক সম্পত্তি করে ফেলেছে। রাজা-মশাইও তাকে বেশ ভালোবাসেন।

রাজামশাই বলেন, "দেখ হে কোটাল, দেশে যাতে অশান্তি না হয় সেটা তোমাকে দেখতে হবে। আর যে-কেউ লোক-ঠকাবে, যে-কেউ ঘুষ নেবে, যে-কেউ পরের ক্ষতি করবে, তার উপযুক্ত শাস্তি হওয়া চাই, বুঝলে? তা না হলে লোকে আমাকে মানতে চাইবে না।"

কোটাল বলে, "তাই তো আমি করি রাজামশাই। লোক-ঠকানো, ঘুষ-নেওয়া পরকে ঠকানো বড় দোষ। আমি ও-গুলো বরদাস্ত করি না।"

রাজামশাই বলেন, "আর চুরি ডাকাতি হলে তাদের একেবারে শূলে চড়িয়ে দেবে। এই তোমাকে হুকুম দেওয়া রইল আমার—"

কোতোয়াল বলে, "আমি তো তাই করি রাজামশাই। আপনি যেমন-যেমন হুকুম করেন, তেমনি-তেমনি করি।"

রাজামশাই বলেন, "আর দেখ, আমার যারা মন্ত্রী-টন্ত্রী আছে, ওদের কথা তুমি শুনো না। ওদের আমি রেখেছি শুধু শোভার জন্যে। চাঁদের চারপাশে যেমন তারা থাকে, ফুলের তোড়ার চারপাশে যেমন দেবদারু-পাতা থাকে, ওরা তেমনি আমার শোভা। তুমি আর আমিই সব। তুমি এমনভাবে দেশ শাসন করবে যাতে আমি আরামে ঘুমোতে পারি, যাতে আমার কোনও অশান্তি না হয়। আমি তোমার হাতে ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত। আর খবর রাখবে কেউ যেন আমার বদনাম না করে, আমার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ না করে—"

কোতোয়াল বলে, "সে আমি সব দেখি রাজামশাই। আপনি নিশ্চিন্তে ঘুমোন, মন্ত্রীদের নিয়ে দরবার করুন, আমি সব দিকে নজর রাখবো। আমার গুপ্তচর চারদিকে ছড়ানো আছে, তারা সব খবর আমার কানে এনে দেয়। আমি যেই শুনি কেউ আপনার বিরুদ্ধে কিছু বলছে, সঙ্গে সঙ্গে তাকে শূলে চড়িয়ে দিই—"

রাজামশাই বলেন, "বেশ করো, বেশ করো—"

কোতোয়াল বলে, "হ্যাঁ রাজামশাই, আমি আপনার নুন খাই, আপনার নুন খেয়ে আমি নিমক-হারামি করতে পারবো না। নিমক-হারামি আমার রক্তে নেই—"

জম্বুদ্বীপের রাজামশাই তাই কোতোয়ালের ওপর সব

ভার ছেড়ে দিয়ে রাজ-দরবারে বসে মন্ত্রীদের সঙ্গে দিন-রাত দাবা খেলেন। রাজামশাইয়ের বড় দাবাখেলার শখ। মন্ত্রীদের কাজ হচ্ছে প্রতিদিন ঠিক নিয়ম করে রাজ-দরবারে আসা আর এক-একজন পালা করে রাজা-মশাইয়ের সঙ্গে দাবা খেলা। যখন একজন মন্ত্রী দাবা খেলে, অন্য মন্ত্রীরা তখন পাশে বসে সেই দাবা খেলা দেখে। দেখে আর রাজামশাইয়ের দাবার চাল দেখে তারিফ করে। ঠিক চাল দিলেও তারিফ করতে হবে, আর ভুল চাল দিলেও তারিফ করতে হবে। কিন্তু সেই দাবা খেলায় রাজামশাই যতই ভুল চাল দিন, তাঁকে জেতাতেই হবে। যদি কেউ ভুল করে রাজামশাইকে দাবা খেলায় হারিয়ে দেয় তো তার গর্দান যাবে।

তা এ-সব কথা এখন থাক, পরে হবে।

আগে কোতোয়ালের কাণ্ড বলি। কোতোয়ালের তো এইরকম অসীম ক্ষমতা। সেই শান্ত্রী বিনোদ দাসের কাছে পঁয়তাল্লিশটা টাকা তো নিলে। নিয়ে প্রথমে গেল নিজের বাড়ি। বাড়িতে গিয়ে বউয়ের হাতে তিরিশটা টাকা দিলে। বললে, "এটা রাখো—"

বউ তো অবাক। জিজ্ঞেস করলে, "এ কী? মোটে তিরিশ টাকা? আজকে এত কম রোজগার হলো কেন?"

শান্ত্রীমশাই বললে, "হবে হবে, এই তিরিশটা টাকাই এখন রাখো, পরে আরো হবে, এখন তো সারা দিনটা পড়ে রয়েছে।"

বলে আর দাঁড়ালো না সেখানে। দৌড়তে দৌড়তে সোজা চলে গেল কোতোয়ালিতে। গিয়ে পেছনের খিড়কি দরজা দিয়ে ঢুকলো। ঢুকে একেবারে খাস কোতোয়ালের ঘরে হাজির হলো।

কোতোয়াল মশাই জিজ্ঞেস করলে, "কী খবর?"

শান্ত্রী বললে, "বড় জবর খবর কোতোয়াল মশাই—"

"তাই নাকি? কী রকম?"

শান্ত্রী মশাই বললে, "দুজন গুপ্তচরকে ধরেছি হুজুর।"

"গুপ্তচর?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ হুজুর। তারা বিদেশ থেকে এখানে ছদ্মবেশে এসেছিল। এসে এ-দেশের খবরাখবর নিচ্ছিল।"

"তাদের দেশ কোথায়?"

শান্ত্রী বললে, "বোম্বাগড়। বোম্বাগড় থেকে এসেছে। দেখতে এসেছে এ-দেশে আমাদের সৈন্য-সামন্ত কত আছে, অস্ত্র-শস্ত্র কত আছে। লুকিয়ে লুকিয়ে নানা জায়গায় ঘুরে বেড়াচ্ছিল, আর খবর নিচ্ছিল। আমি তাদের ধরে এনেছি।"

কোতোয়াল জিজ্ঞেস করলে, "ধরে এনেছ? তাহলে তো ভালোই হয়েছে, কালই তাদের শূলে চড়িয়ে দাও—আমার হুকুম। আজকে তাদের হাজতখানায় পুরে রাখো—"

শান্ত্রী আর দেরি করলে না। সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

কান্তিনারায়ণ আর দাশরথি তখনও কোতোয়ালির বাইরে হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছে। শান্ত্রী অনেকক্ষণ হলো ভেতরে গেছে। কিন্তু এত দেরি হচ্ছে কেন? আর কতক্ষণ সেখানে দাঁড়িয়ে থাকবে তারা? ক্ষিধেও পেয়েছে খুব।

আপনার মেয়ের
বিয়ের জন্য
ইউ. আই. বি.
ক্যাশ সার্টিফিকেটে
অর্থ বিনিয়োগ করুন

৫০০০ টাকার একটি **ক্যাশ সার্টিফিকেট**
২০ বছর পরে
আপনাকে দেবে ৩৬,৬০০ টাকা
ইউ, আই বি-এর অন্যান্য সেভিংস স্কীমের মধ্যে আছে ঃ

* **ফিক্সড ডিপজিট অ্যাকাউণ্ট ৫ বছরের বেশী মেয়াদের স্থায়ী আমানতের ওপর ১০% হারে সুদ পাবেন।**
* **রেকারিং ডিপজিট অ্যাকাউণ্ট প্রতি মাসে ১০ টাকা করে জমালে ৭ বছর পরে পাবেন ১২২০ টাকা।**

নিয়মিত মাসিক আয়ের ক্ষেত্রে মান্থলি সার্টিফিকেট স্কীম

১২০০০ টাকা ৬১ মাসের জন্য বিনিয়োগ করলে প্রতি মাসে ১০০ টাকা আয়।

পূর্ণ বিবরণের জন্য যোগাযোগ করুন।

ইউনাইটেড ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ব্যাংক লিমিটেড
৭, রেডক্রস প্লেস, কলকাতা—৭০০ ০০১
টেলিফোন ঃ ২৩–৯৭৮৪ (৩টি লাইন)

দাশরথি বললে, "আর এখানে শুধু-শুধু দাঁড়িয়ে কী হবে বড় দাদাবাবু। চলুন বড় দাদাবাবু, চলে যাই. বাসায় গিয়ে কিছু খাই গে—"

কান্তিনারায়ণ বললে, "তাই চলো দাশরথি. এখানে কোতোয়ালের কাছে নালিশ করে আর কিছু হবে না—"

দাশরথি বললে, "হ্যাঁ, আমারও তাই মনে হচ্ছে, চলুন—"

রাস্তায় চলতে চলতে কান্তিনারায়ণ বললে. "এ তো দেখছি এক তাজ্জব দেশ দাশরথি। প্রথমে কত লোক আমাদের সাহায্য করতে এগিয়ে এল, এখন একটা লোকেরও টিকি দেখা যাচ্ছে না।"

দাশরথি বললে, "আমি শুনেছি, বড়-দাদাবাবু, এখানকার রাজামশাই নাকি সারাদিন দরবারে বসে বসে মন্ত্রীদের সঙ্গে দাবা খেলে—"

কান্তিনারায়ণ বললে, "সেই জন্যেই দেশের এই হাল। অত দাবা খেলার নেশা হলে কি কেউ রাজ্য চালাতে পারে—"

দাশরথি বললে, "তাই তো দেখছি, রাজা প্রজা সবাই সমান।"

কান্তিনারায়ণ বললে, "কীর্তি এখন কোথায় আছে কে জানে। সে হয়ত এতদিনে বোকা খুঁজে নিয়ে বোম্বাগড়ে ফিরে গিয়েছে। তা যাক, কীর্তিই রাজা হোক, আমার আর রাজা হয়ে দরকার নেই। রাজা হওয়ার অনেক ঝকমারি। তার চেয়ে প্রজা হয়ে থাকার অনেক সুবিধে। এবার আর দেরি নয়, জাহাজ তো সমুদ্রে তৈরিই আছে, আমরা বোম্বাগড়েই ফিরে যাই—"

বলে রাস্তা দিয়ে বাসার দিকে যাচ্ছিল, হঠাৎ পেছন থেকে একটা চিৎকার কানে এল, "পালাচ্ছে, পালাচ্ছে, ওই গুপ্তচর পালাচ্ছে, পাকড়ো, পাকড়ো—"

কান্তিনারায়ণ আর দাশরথি দুজনেই পেছন ফিরে দেখলে কোতোয়ালির সেই শান্ত্রীটা দৌড়তে দৌড়তে তাদের দিকেই আসছে—

আর তার চেঁচামেচিতে রাস্তার আরো কিছু লোক তাদের দিকে লক্ষ্য করে দৌড়ে এসে তাদের ধরে ফেললে। জাপটে ধরে রইল।

ততক্ষণে শান্ত্রীটাও দৌড়ে এসে তাদের ঘাড় ধরে ফেলেছে।

বললে, "কোথায় পালাচ্ছিস তোরা। গুপ্তচর হয়ে এদেশে এসে ভেবেছিস পালিয়ে বাঁচবি? চল্, কোতোয়ালিতে চল্—"

(ক্রমশ)

ছবি এঁকেছেন ॥ সুধীর মৈত্র

পয়সাকড়ি

অমিতাভ চক্রবর্তী

পয়সাকড়ির দরকারের কথা কে আর না জানে। কথায় বলে, ফ্যালো কড়ি মাখো তেল। তার মানে, বিনে পয়সায় কিছু পাওয়া যায় না। কিন্তু গোড়াতেই পয়সাকড়ির ব্যাপারটা আসেনি। বহু যুগ আগে, খৃষ্টের জন্মেরও অনেক আগে কিছু পেতে হলে কিছু দিতে হতো। সেটা ছিলো জিনিসের বদলে জিনিস। শস্যের বদলে শস্য। একে বলে বিনিময়-প্রথা।

তারপর একটা সময় এলো, যখন এক দেশের লোক হাটবাজার করতে যেতো অন্য দেশে। অর্থাৎ কিনা বাণিজ্য করা। তখন বিনিময় প্রথায় নানারকম অসুবিধে দেখা দিল। কারো হয়তো নিজের শস্য সবটা দিয়ে দেওয়ার দরকার নেই। কিন্তু দিয়ে দিতেই হতো। কারণ, শস্য জমিয়ে রাখলে নষ্ট হওয়ার ভয়। কারো হয়তো এতো জিনিস কেনার দরকার নেই। কিনতেই হতো। নইলে ক্ষতি। তখন মনে হলো, এমন একটা কিছু থাকা দরকার যা শস্য বা অন্য জিনিসের বদলে নেওয়া যেতে পারে এবং জমিয়ে রেখে পরের বছর অনায়াসে তাই দিয়ে প্রয়োজন মতো জিনিস পাওয়া যেতে পারে। অর্থাৎ, এবার ব্যাপারটা দাঁড়ালো কেনা ও বেচার মধ্যে একটা সম্পর্ক গড়ে তোলা। এই সম্পর্কটা রাখছে টাকা-পয়সা।

এইভাবেই একদিন টাকা-পয়সার ধারণাটা মানুষের মাথায় এলো। এখন আমরা টাকা পয়সা বলতে যা বুঝি, গোড়ায় ব্যাপারটা কিন্তু সেরকম ছিলো না। প্রথম দিকে একখণ্ড সোনা, একটুকরো রুপো টাকা-পয়সার মতো ব্যবহৃত হতে লাগলো। কিছুকাল পরে এতেও দেখা দিলো নানারকমের গোলমাল। এক খণ্ড সোনা বা এক টুকরো রুপোর দাম তো সত্যি সত্যি সমান হতে পারে না! তাহলে দুই-এর মধ্যে দামের সম্পর্কটা কী দাঁড়াবে? যার যা খুশি, তাই দাম ধরবে?

তা তো হতে পারে না। একটা কিছু ঠিক করতেই হবে। কে করবে? দেশের রাজার উপর সে দায়িত্ব পড়লো। বিভিন্ন ধাতুর পাতের উপর ছাপ মেরে তৈরি হলো মুদ্রা। আর নানা ধাতুর মুদ্রার মধ্যে দামের সম্পর্কও ঠিক করে দেওয়া হলো। মনে করো, ওইরকম ২০টি রুপোর মুদ্রার সমান হলো একটি সোনার মুদ্রা।

জানা গিয়েছে, প্রথম মুদ্রার প্রচলন হয় খৃষ্টপূর্ব সপ্তম শতকের শেষ দিকে এশিয়া মাইনরের লিডিয়া রাজ্যে। প্রায় একই সময়ে দূর প্রাচ্যের দেশগুলিতেও মুদ্রা ব্যবহারের কথা জানা যায়। চীন ও ভারতেও তার কিছু পর থেকেই মুদ্রা চালু হতে দেখা যায়। তারপর গ্রীক সাম্রাজ্যে মুদ্রা চালু হয় ব্যাপকভাবে। আলেকজানডারের এশিয়া জয় এবং ভারতের সীমান্ত পর্যন্ত বিজয়-অভিযানের ফলে মুদ্রার ব্যবহার দারুণভাবে ছড়িয়ে পড়ে।

প্রাচীনকালে মুদ্রা তৈরি হতো বেশির ভাগই সোনা বা রুপো দিয়ে। কিন্তু লিডিয়াতে প্রথম মুদ্রার যে সন্ধান পাওয়া গিয়েছে, গ্রীক ঐতিহাসিক হেরোডোটাসের মতে তা ছিল ইলেকট্রাম নামে একরকমের মিশ্র ধাতুর তৈরি। লিডিয়ার নদীর স্রোতে ভেসে আসতো এই প্রাকৃতিক মিশ্র ধাতু—সোনা ও রুপোর মিশ্রণ। লিডিয়াতে প্রায় একই সঙ্গে সোনার মুদ্রাও তৈরি হয়।

সোনা ও রুপোর পরেই আসে তামা, ব্রোনজ, দস্তার তৈরি মুদ্রা। রুপোর মুদ্রার প্রাচীনতম নিদর্শন পাওয়া যায় গ্রীস দেশের একটি রাজ্যে। রাজ্যটির নাম এজিনা। খৃষ্টপূর্ব সপ্তম শতকেই এই রাজ্যে প্রথম রুপোর মুদ্রা তৈরি হয়। ব্রোনজ ও তামার মুদ্রা প্রথম তৈরি হয় গ্রীসে খৃষ্টপূর্ব পঞ্চম শতকে। পরে আধুনিককালে মুদ্রা তৈরিতে নানারকমের মিশ্র ধাতুর ব্যবহার হতে থাকে। একটা কথা মনে রাখা দরকার, যেসব ধাতু সহজে ক্ষয় হয় না এবং পরিমাণে বেশি পাওয়া যায়, সেগুলিই মুদ্রা তৈরির কাজে ব্যবহার করা হতো। সীসে খুব সহজেই ক্ষয়ে যায়। এ দিয়ে বড় একটা মুদ্রা তৈরি হয় না। তবু ভারতে অন্ধ্র-রাজারা একসময় সীসের মুদ্রা চালু করেছিলেন। একসময় মালয়দেশেও সীসের মুদ্রা চলতো। লোহায় চট করে মরচে ধরে যায়। তবু গ্রীসের স্পারটা রাজ্যে লোহার মুদ্রা চালানো হয়েছিল। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় জারমানিতে লোহার মুদ্রার ব্যবহার দেখতে পাওয়া যায়। পেতলের পাতের উপর সই দেগে মুদ্রা বলে চালাতে চেষ্টা করেছিলেন মুহম্মদ বিন তুঘলক। সোনা বা রুপোর ক্রমেই অভাব দেখা দিতে লাগলো। তাছাড়া এত সোনা বা রুপো বাইরে ছড়ানো থাকলে রাজকোষে আর থাকে কী? কাজেই সোনা বা রুপো জমা রেখে অনুপাত-মূল্য স্থির করে প্রতীক হিসাবে পেতলের মুদ্রা চালু করেছিলেন মুহম্মদ বিন তুঘলক। চিন্তার দিক থেকে এটা ছিলো অত্যন্ত আধুনিক। কেননা, এইরকম চিন্তাকে ভিত্তি করেই আধুনিক মুদ্রা ব্যবস্থার শুরু হয়েছে পরে। কিন্তু মুহম্মদ বিন তুঘলক সেদিন সফল হতে পারেন নি। জাল মুদ্রা ঠেকানোর তিনি কোন ব্যবস্থা করতে পারেন নি। দস্তার মুদ্রা প্রথম চালু হয়েছিলো রোমে এবং চীনদেশে।

ধাতুর তৈরি মুদ্রা ছাড়াও অন্যরকমের মুদ্রাও দেখতে পাওয়া যায়। যুদ্ধবিগ্রহের সময়, প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের পর অন্যরকমের মুদ্রা দিয়ে সাময়িকভাবে কাজ চালানোর চেষ্টা হয়েছে। এখন যেমন কাগজের নোট দেখতে পাওয়া যায়, সেকালেও তেমনি কাগজের মুদ্রার সন্ধান পাওয়া যায়। চীনে তাং রাজবংশের আমলে কাগজের টুকরোর উপর ছাপ দিয়ে তা মুদ্রার মতো ব্যবহার করা হতো। চামড়ার মুদ্রা, কাপড়ের মতো মুদ্রারও নাকি অস্তিত্ব ছিলো। মারকোপোলোর বিবরণ থেকে জানা গিয়েছে, কুবলাই খাঁ-র আমলে কাগজের মুদ্রার

বেশ প্রচলন ছিলো। আর একটা কথা। আমরা বলি, পয়সাকড়ি বা টাকাকড়ি। এ থেকে বোঝা যায়, এককালে আমাদের দেশে কড়ি পয়সার মতো ব্যবহৃত হতো। শোনা যায়, তীর্থযাত্রীরা সঙ্গে করে কড়ি নিয়ে যেতেন। দেবস্থানে পয়সার মতো কড়ি প্রণামী দেওয়া হতো। কুড়িটি কড়ির দাম ছিলো এক পয়সা।

পুরোনো মুদ্রাগুলি দেখতে কেমন ছিলো? নানা রকমের মুদ্রা তোমরা এখনও দেখতে পাও। গোলাকার, চৌকোনো, ছ'কোনা, আটকোনা, তিনকোনা গোলাকার-মাঝখানে ছিদ্র, গোলাকার কিন্তু পরিধি ঢেউ খেলানো ইত্যাদি। প্রাচীনকালের মুদ্রাগুলির বেশ কয়েকটি ছিলো সম্পূর্ণ অন্য ধরনের। চীন দেশে প্রাচীনকালে এমন সব মুদ্রা প্রচলিত ছিলো যেগুলি ছোটখাটো ছুরির মতো দেখতে। কোনোটা ছিলো খুদে কোদালের মতো। কোনোটা আবার আংটা লাগানো ছোট্ট কুঠার। প্রাচীন মিশরে একরকমের মুদ্রা ছিলো সোনার রিং-এর মতো। মিনি হাতুড়ির মতো দেখতে মুদ্রারও সন্ধান পাওয়া যায়।

সাধারণভাবে ধাতুর পাত সাইজ মতো কেটে নিয়ে তার উপর ছাপ দিয়ে মুদ্রা তৈরি করা হতো। কাঠের ছাঁচের উপর গলানো ধাতু ঢেলে দিয়েও মুদ্রা তৈরি হতো। যাই হোক, মুদ্রাগুলিতে কিসের ছাপ থাকতো? প্রথম দিকের মুদ্রাগুলির গায়ে থাকতো দেবদেবীর প্রতিকৃতির ছাপ। গ্রীকদেশের মুদ্রাগুলিতে দেবতা জিউস-এর প্রতিকৃতি খুব বেশি ছাপা হতো। ভারতেও দেখা গিয়েছে হিন্দু দেবদেবীর মূর্তি। মূর্তি ছাড়াও নানা-রকমের জন্তু পাখির প্রতিকৃতিও অঙ্কিত হতো।

মুদ্রার গায়ে অক্ষর খোদাই-এর প্রথম নিদর্শন অবশ্য পাওয়া যায় খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে এথেন্স-এ। দেবদেবীর বদলে রাজার প্রতিমূর্তি অঙ্কনের রেওয়াজ চালু হয় আলেকজানডারের মৃত্যুর পর। মুদ্রার গায়ে ক্রমে রাজার প্রতিমূর্তি, রাজার নাম, সন তারিখ টাঁকশালের নাম এসব খোদাই হতে লাগলো। কোন দেশ জয়ের স্মৃতি-চিহ্ন হিসাবেও অনেক সময় মুদ্রার প্রচলন করা হতো। তাতে যুদ্ধজয়ের ঐতিহাসিক তথ্য লেখা থাকতো। রাজার যশোগান মুদ্রার গায়ে পদ্যাকারে লেখার রেওয়াজও ছিলো।

আমাদের দেশে মুদ্রার ইতিহাসও অনেক দিনের। কড়ির কথা আগেই বলেছি। তারও আগে মনুসংহিতায় সোনা, রুপো ও তামার মুদ্রার উল্লেখ আছে। রামায়ণ মহাভারতে সোনা ও রুপোর মুদ্রার ছড়াছড়ি। কিন্তু এসবের কোন নিদর্শন আমাদের হাতে নেই। তবে চৌকোনা চেহারার রুপোর ও একরকমের তামার মুদ্রার কথা জানা যায়, যেগুলি নাকি খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকের। খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকে তামার মুদ্রায় গ্রীক প্রভাব স্পষ্ট। সত্যি বলতে কি, আলেকজানডারের ভারতে আসার অল্প পরেই ভারতে যেসব মুদ্রা চালু হয়েছিল, তার নিদর্শন প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়।

ভারতের মুদ্রাগুলি দু'রকমের। এক, হিন্দু-রাজাদের আমলের, দুই, মুসলমান আক্রমণের পর ইসলাম প্রভাবিত। কুষান আমলের মুদ্রাগুলিতে ব্যবহৃত হতো ইরানীয় ভাষা। আবার গুপ্ত আমলের মুদ্রায় ব্যবহৃত ভাষা ছিলো সংস্কৃত। হিন্দুদের মুদ্রাগুলিতে দেবদেবীর প্রতিকৃতি আঁকা থাকতো। আবার পশুপাখিরও ঠাঁই ছিলো। এটা নিঃসন্দেহে গ্রীক প্রভাব। গান্ধার দেশের মুদ্রায় ছিলো ষাঁড় ও ঘোড়সওয়ার-এর মূর্তি। চালুক্য রাজবংশের আমলের মুদ্রায় দেখা যায় শূকরের প্রতিকৃতি। হিন্দুদের মুদ্রায় প্রধানত সোনা ও রুপোই বেশি ব্যবহৃত হতো।

মুসলমানরা এদেশে আসার পর বড় রকমের পরিবর্তন ঘটে। অষ্টম শতাব্দীর পরই এই পরিবর্তন সবচেয়ে বেশি করে চোখে পড়ে। তার আগে অবশ্য আরবদের প্রভাব পড়েছে। মুহম্মদ ঘোরীর আমলে প্রথম 'টংকা' চালু হয়। যা থেকে টাকা কথাটা এসেছে। সোনা ও রুপো—দু'রকমেরই 'টংকা' পাওয়া যায়।

শেরশাহের আমলেই প্রথম ভারতীয় মুদ্রায় ইসলাম জগতের চার প্রধান খলিফার নাম খোদিত হয়।

মুঘল আমলে পাওয়া গেল রুপী ও মোহর। আমরা মোহর বলতে বুঝি কেবল সোনার তৈরী। সেকালে মোহর রুপোরও তৈরী হতো।

দিনে দিনে মুদ্রার মুদ্রণ-সৌকর্য বাড়তে থাকে। সেকালে জাহাংগীরের আমলে মুদ্রার শিল্প সৌন্দর্য ছিলো অসাধারণ।

এরপর একেবারে হাল আমলের কথা। ভারতে শুরু হলো ইষ্ট ইনডিয়া কোম্পানির আমল। তারপর থেকে সরাসরি ব্রিটিশ সরকারের আমল। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দ থেকে তারাও টাকা পয়সা চালু করলো। কিন্তু ততক্ষণে কাগজের টাকা বা নোট চালু হয়ে গিয়েছে। স্বাধীনতার পর ভারতে মুদ্রার ব্যাপারে সবচাইতে গুরুতর পরিবর্তন এনেছে নয়া পয়সা ১৯৫৭ সালে। এই নয়া পয়সা চালু হওয়ার ফলে হিসাবের নিয়ম কানুন পর্যন্ত বদলে গেল। আগে ছিলো ৬৪ পয়সায় ১ টাকা। এখন হলো ১০০ পয়সায় একটাকা।

আগেই বলেছি কাগজের টাকা প্রথম চালু হয় চীন দেশে এবং রাজাদের আমলে। সেটা অষ্টম শতাব্দীর কথা। কিন্তু এখনকার মতো কাগজের নোটের প্রচলন হয় সর্বপ্রথম ষোড়শ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে। এক টাকার নোট বাদ দিলে, বাকি সব নোটকেই বলা হয় 'প্রমিসরি নোট'। এই নোটের প্রথম প্রচলন করেন ব্যাংক অব সুইডেন ১৬৬১ খৃষ্টাব্দে। ব্যাংক অব ইংল্যান্ড নোট চালু করে ১৬৯৪ খৃষ্টাব্দে।

টাকা পয়সা সবই তৈরি হয় টাঁকশালে। প্রাচীনকালে এখনকার মতো টাঁকশাল ছিলো না। সেগুলি অনেকটা গ্রামীণ কুটির শিল্পের মতোই ছিলো। পরে রাজাদের নিজস্ব টাঁকশাল হতে থাকে। ভারতে ষষ্ঠ শতাব্দীতে যে টাঁকশাল ছিলো তার প্রমাণ পাওয়া যায়। বড় আকারে ভারতে প্রথম ইষ্ট ইনডিয়া কোম্পানিই টাঁকশাল বসায় ১৬৬১ খৃষ্টাব্দে মাদরাজে। তারপর বোমবাইতে ১৬৭১ খৃষ্টাব্দে। আর কলকাতায় ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে। ক্রমে কলকাতার টাঁকশালই প্রধান কেন্দ্র হয়ে ওঠে। বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে টাকা পয়সা তৈরির পদ্ধতিরও অনেক পরিবর্তন ঘটে যায়। কলকাতায় আধুনিক টাঁকশাল স্থাপিত হয় ১৮২৯ সালে। তখন ভারতের আশ পাশের দেশের টাকা পয়সাও এখানেই তৈরি হতো। দেশীয় রাজারাও তাঁদের মুদ্রা এখান থেকেই তৈরি করিয়ে নিতো। সময়ের সঙ্গে তাল রাখতে গিয়ে কলকাতার টাঁকশালকে আবার পোশাক বদলাতে হলো। এবার আরো বড় আকারে নতুন করে তৈরি হলো আলিপুর টাঁকশাল ১৯৫২ সালে। ভারতে এখন মোট তিনটি টাঁকশাল আছে।

বাঘের খাবার

নীহাররঞ্জন গুপ্ত

রবিবারের সকাল।

বিরূপাক্ষর ওখানে গিয়ে দেখি, ক্যামবিসের ইজি-চেয়ারটায় গা ঢেলে দিয়ে, হাতে একটা জ্বলন্ত চার্মিনার সিগ্রেট, বিরূপাক্ষ চোখ বুজে পড়ে আছে, আর তারই পাশে একটা চকোলেট-বারের স্বাদগ্রহণ করতে করতে মিতুলবাবু কী যেন সব বলে যাচ্ছে।

বিরূপাক্ষর চক্ষু দুটি বোঁজা।

তার শিথিল ভঙ্গি থেকেই বোঝা যায়, এক পক্ষ কথা বলে চললেও অন্য পক্ষ একটু যেন অন্যমনস্ক।

তবু আমার পদশব্দ বিরূপাক্ষের কানে প্রবেশ করেছিল। সে চোখ না খুলেই বললে, "আরে শিশির, বোস···"

আমি একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসতে বসতে মিতুলবাবুর দিকে তাকিয়ে বললাম, "মিতুলবাবুর কী বলা হচ্ছে শুনি। রূপকথা, না কোন রহস্য কাহিনী?"

মিতুল একবার আমার দিকে যেন একান্ত তাচ্ছিল্যভরে তাকাল, তারপরই আমাকে যেন সম্পূর্ণ অবজ্ঞা করেই বিরূপাক্ষর দিকে তাকিয়ে বললে, "কাকু, আমার কথা তুমি শুনছো না।"

"কে বললে! না, না— সব শুনেছি গোড়া থেকে।"

"শুনেছো?"

"হুঁ।"

"বেশ, বল তাহলে, রাঘবেন্দ্রবাবু পরশু কেন তোমার কাছে এসেছিলেন?"

"তার রূপোর নস্যির-কৌটোটা হারিয়ে গেছে সেটা..."

"কিছুই তাহলে তুমি মনে হচ্ছে বুঝতে পারনি কাকু।" বেশ গম্ভীরভাবে কথাটা বললে মিতুলবাবু।

আমি ব্যাপারটা আদৌ না বুঝতে পেরে একবার মিতুলবাবু ও একবার বিরূপাক্ষর মুখের দিকে তাকালাম।

বির্পাক্ষ ততক্ষণে চোখ মেলে উঠে সোজা হয়ে বসেছে ক্যাম্বিসের চেয়ারটার উপরে। তার ঠোঁটে মৃদ্ হাসির আভাস।

"ব্ঝতে পারিনি?" স্মিতহাস্যে বির্পাক্ষ বললে।

"হ্যাঁ।"

"তা হবে। তা তুমি কী বলতে চাও?"

"তুমি কি সত্যিই মনে করো সামান্য একটা র্পোর নস্যির-কৌটো হারিয়ে গিয়েছে বলে ঐ রাঘবেন্দ্র সাহার মত লোকটা তোমার কাছে এসেছিলেন?"

"কেন, লোকটার মধ্যে এমন কী বিশেষত্ব ছিল মিতুলবাব্?"

"তিনি যে গাড়িটায় চড়ে এসেছিলেন, সেটা তুমি দেখেছিলে?"

"না তো। কেন—গাড়িটা—"

"ইমপোর্টেড কার।"

"তাই নাকি?"

"হ্যাঁ, ঐ যে একদিন ম্যাগাজিনের ছবি দেখছিলাম, বিরাট একটা সব্জ রংয়ের প্লিমাউথ গাড়ি, তার নম্বরটা তুমি নিশ্চয়ই ভুলে যাওনি—"

"নম্বরটা?"

"হ্যাঁ, সেই গাড়িটাতে চড়েই রাঘবেন্দ্র সাহা পরশ্ সকালে তোমার কাছে এসেছিলেন।"

"সত্যি বলছো মিতুলবাব্?"

"হ্যাঁ, নম্বরটা আমার মনে ছিল, দেখলাম রাঘবেন্দ্র-বাব্র গাড়ির নম্বর ও রং একই।"

"তাহলে—"

"আমার মনে হয় র্পোর সেই নস্যির-কৌটোটা সামান্য একটা নস্যির-কৌটো মাত্র ছিল না।"

"কেন?" বির্পাক্ষ যেন বেশ কৌতুক বোধ করে মিতুলের কথায়। সে তাকাল মিতুলের ম্খের দিকে।

"তুমিই তো সব সময় বলো, কোনও রহস্যের কিনারা করতে হলে সমস্ত পারিপার্শ্বিক, প্রতিটি মান্ষ, প্রতিটি জিনিসকে খ্ঁটিয়ে খ্ঁটিয়ে দেখতে হয়, এবং কোথায় কোন্ ব্যাপারে তেমন মিল খ্ঁজে পাওয়া যাচ্ছে না নজর দিয়ে দেখতে হয়। বলোনি তুমি?"

"হ্ঁ, বলেছি।"

"তবে? যে-মান্ষটা অমন একটা দামী গাড়ি চেপে আসে, সে কখনও সামান্য একটা র্পোর নস্যির-কৌটো হারালে তোমার কাছে ছ্টে আসে? লোকটার ত কত টাকা, কত বড়লোক ও।"

আমি এতক্ষণ ওদের কথা শ্নছিলাম। ছেলেটার তো দার্ণ ব্দ্ধি দেখছি।

মিতুল তখনও বলে চলেছে, "একটা র্পোর নস্যির-কৌটো হারিয়েছে তো কী। আর-একটা কৌটো গড়ে নিলেই তো হত—"

"তাহলে মিতুলবাব্," সহাস্যে বির্পাক্ষ বললে, "তোমার মনে হচ্ছে ঐ কৌটোটার মধ্যে নিশ্চয়ই কোন রহস্য আছে, তাই না?"

"হ্যাঁ।"

"তা কী রহস্য থাকতে পারে বলে তোমার মনে হয়?"

"একটা হীরে থাকতে পারে, কিম্বা কোন দামী কিছ্ হয়ত ছিল কৌটোটার মধ্যে, যে জন্যে রাঘবেন্দ্রবাব্ এত ব্যস্ত হয়ে তোমার কাছে ছ্টে এসেছেন।"

এতক্ষণে আমি কথা বললাম। "ব্যাপার কী বির্! কোন্ নস্যির-কৌটোর কথা আমাদের মিতুলবাব্ বলছে?"

বির্পাক্ষ বললে, "বিখ্যাত জ্য়েলার রাঘবেন্দ্র সাহার নাম শ্নেছিস?"

"শ্নবো না কেন? রাঘবেন্দ্র সাহা অ্যানড সন্স।"

"তাঁর একটা নিত্যব্যবহার্য র্পোর তৈরী নস্যির-কৌটো হারিয়েছে।"

"তারপর?"

"সেই ব্যাপারেই গত পরশ্ রাঘবেন্দ্র সাহা আমার কাছে এসেছিলেন।"

"তা কেমন করে হারালো কৌটোটা?"

"আজ তো এগারোই সেপটেমবর, গত ৮ই সেপটেমবর তাঁর বাড়িতে একটা ভোজ ছিল তাঁর নাতির জন্মদিন উপলক্ষে, সেই ভোজে অনেকে এসেছিল। রাঘবেন্দ্র সাহার ধারণা, সেই ভোজে যারা এসেছিল, তাদের মধ্যেই কেউ তাঁর নস্যির-কৌটোটা হাতিয়েছে। রাঘবেন্দ্র সাহা যেমন করেই হোক সেই কৌটোটা মানে আসল কৌটোটা ফিরে পেতে চান।"

"আসল মানে?"

কথা বললে এবারে মিতুলবাব্। বললে, "তাঁর ধারণা, কোন এক সময় কেউ কৌশলে অন্য একটা ঠিক অমনি র্পোর নস্যির-কৌটোর সঙ্গে আসল কৌটোটা বদল করে নিয়েছে। তিনি ব্ঝতেই পারেননি।"

"হ্ঁ। তা মিতুলবাব্, তোমার কী মনে হয়?" প্রশ্ন করলাম আমি।

"আমার মনে হয় ঐ কৌটোর মধ্যে কিছ্ ছিল। কোন কিছ্ দামী জিনিস।"

আমি বির্পাক্ষের ম্খের দিকে তাকালাম।

বির্পাক্ষ বললে, "আমারও তাই ধারণা শিশির। যদিও রাঘবেন্দ্রবাব্ বলছিলেন, কৌটোটার তাঁর কাছে একটা বিশেষ ম্ল্য আছে, যেহেতু সেটা তাঁর স্বর্গীয় বাবা মহেন্দ্র সাহার ব্যবহৃত নস্যির-কৌটো ছিল, মৃত বাপের স্মৃতিচিহ্ন একটা।"

মিতুলবাব্ এই সময় আবার বললে, "আসল কথাটা উনি চেপে গিয়েছেন নির্ঘাত।"

বির্পাক্ষ বললে, "আমারও তাই মনে হয় শিশির।"

"কাকু, চলো না একবার রাঘবেন্দ্র সাহার বাড়িতে যাই।" মিতুলবাব্ বললে।

"কেন বলতো মিতুলবাব্?"

"ঐ ফাঁকে বাড়ির সেই ঘরটা দেখা যাবে, যে-ঘরে রাঘবেন্দ্রবাব্র আত্মীয়-বন্ধ্রা সেই তারিখে গল্পগ্জব করেছে।"

"আমারও মনের ইচ্ছা তাই মিতুলবাব্।" বির্পাক্ষ বললে, "একবার স্পট্টা ঘ্রে এলে আমাদের অন্সন্ধানের ব্যাপারে সাহায্য হবে।"

"কাল তো আমাদের স্কুল ছ্টি, কালই চলো না কাকু।"

"বেশ। তাই চলো। যাওয়া যাবে। কীরে শিশির, তুই যাবি নাকি?"

"বেশ তো, চল্।"

॥ ২ ॥

বির্পাক্ষই ফোন করে বাবস্থা করেছিল আগে থাকতে।

পরের দিন তিনজনে আমরা বির্পাক্ষর ঝরঝরে গাড়িটা চেপে সাহা-ভবনে গিয়ে হাজির হলাম বিকেলের দিকে।

ওল্ড বালিগঞ্জ অঞ্চলে একট্ ভিতরের দিকে বিরাট

তিনতলা বাড়ি—অনেকখানি জায়গা জুড়ে। সামনে ও পিছনে বাগান. বাড়িটার দিকে তাকালেই একটা ঐশ্বর্য ও প্রাচুর্যের স্পষ্ট আভাস যেন পাওয়া যায়।

রাঘবেন্দ্রবাবু নীচেই ছিলেন পারলারে।

সংবাদ পেয়ে আমাদের সেখানেই ডেকে পাঠালেন।

পারলারটা ঠিক একটা ঘর নয়, বিরাট আকারের হল-ঘর। হলঘরটার বিস্তৃত মেঝে জুড়ে দামী কার্পেট বিছানো। এখানে-ওখানে নানা রকমের দর্শনীয় দ্রব্য, কাচের আলমারি, পুরনো আমলের সেটি সোফা। দর্শনীয় বস্তুর মধ্যে যে দুটি আমাদের তিনজনেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল, তা হল দুই কোণে দুটি বাঘ।

বিরাট আকারের বাঘ। রয়াল বেংগল টাইগার। মুখ-ব্যাদান করে আছে।

দুটো বাঘের দুই জোড়া কাচের চোখ যেন জ্বলছে।

মিতুল ঘরে ঢুকেই সেই বাঘের একটার দিকে এগিয়ে গেল, এবং চেয়ে-চেয়ে দেখতে লাগল বাঘটাকে।

আমি রাঘবেন্দ্র সাহার দিকে তাকালাম। ভদ্রলোকের বয়েস হয়েছে। ষাটের উপরে তো হবেই। কিন্তু দেহের বাঁধুনি এখনো চমৎকার। পরনে একটা ধবধবে শান্তি-পুরী ধুতি, গায়ে একটা শাদা বেনিয়ান, চোখে চশমা। পুরু লেন্সের চশমা।

"আসুন, আসুন, মিঃ সেন।" সাদর আহ্বান জানালেন রাঘবেন্দ্র। তারপরেই একটু থেমে বললেন, "যে ঘরে সেদিন সবাই বসেছিল, বিশেষ করে সেই ঘরটা আপনি দেখতে চান বলেছিলেন—"

"হ্যাঁ. আগে সেই ঘরটা দেখতে চাই।"

"এইটাই সেই ঘর, উৎসব-টুৎসব হলে এই ঘরেই আমরা সকলে মিলিত হই।"

"এই ঘর?"

"হ্যাঁ।"

বিরূপাক্ষ অতঃপর ঘরটা ঘুরে ঘুরে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল। মিতুল কিন্তু তখনো সেই বাঘটার সামনে দাঁড়িয়ে।

"আচ্ছা মিঃ সাহা—" বিরূপাক্ষ ডাকলো।

"বলুন।"

"এমনও তো হতে পারে, আপনারই বিশেষ কোন পরিচিত বন্ধু, যাঁকে আপনি চট্ করে সন্দেহ করবেন না অথচ যিনি জানতেন ঐ রুপোর নস্যির-কৌটোটার মূল্যে আপনার কাছে কতখানি ছিল, তিনিই কোন এক ফাঁকে কৌশলে আপনার কৌটোটার সংগে নকল একটা কৌটো দিয়ে বদল করে নিয়েছেন।"

"কিন্তু—"

"ধরুন, তিনি আপনার কৌটোটার গঠন খুব ভাল করেই জানতেন। তাই অবিকল একটা কৌটো তৈরি করে সংগে করে এনেছিলেন আপনার কৌটোটা হাত করার জন্য, তারপর সময় ও সুযোগমতো...আচ্ছা, আপনি কি কৌটোটার বিশেষত্বের কথা কখনো কোন বন্ধুকে বলে-ছিলেন?"

"মিঃ সেন, তাহলে আপনাকে খুলেই বলি, সেদিন কথাটা বলিনি। কৌটোটা কেবল মাত্র একটা নস্যির কৌটোই নয়. এই যে দেখুন কৌটোটা..." বলতে বলতে কৌটোর প্যাঁচ দেওয়া মুখটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে খুলে দেখালেন।

আশ্চর্য। আমরা দেখলাম. ঢাকনির তলায় একটা এক ইঞ্চি পরিমাণ পেরেকের মত বস্তু।

"এই যে দেখছেন মিঃ সেন. আমার কৌটোর মধ্যেও ঠিক এমনটি ছিল এবং সেটি ছিল আমার একটি সেফের চাবি. যে-চাবির সাহায্যেই আয়রন সেফটা খোলা যেত। বিখ্যাত এক লক মেকারকে দিয়ে ঐ চাবি ও সিন্দুকের লক আমার বাবা তৈরী করেছিলেন।"

মিতুলও ইতিমধ্যে আমাদের পাশে এসে দাঁড়িয়ে শুনতে থাকে। সে হঠাৎ বলল. "ঐটা দিয়ে সিন্দুকটা আপনার খুলছে না বুঝি?"

মিতুলের গলার স্বরে ও প্রশ্নে তার দিকে একটু যেন বিরক্তিভরেই তাকিয়ে রাঘবেন্দ্র সাহা বললেন. "এ ছেলেটি কে মিঃ সেন?"

"মিতুলবাবু।—আমার খুদে সহকারীও বলতে পারেন

ওকে। মিঃ সাহা, ওকে অবহেলা করবেন না—একসেপশেনালি ইনটেলিজেন্ট।" বলে বিরূপাক্ষ মিতুলের দিকে তাকিয়ে বললে, "না মিতুলবাবু, ওটা তো আসল চাবি নয়, নকল, তাই ওটা দিয়ে উনি সিন্দুক কেমন করে খুলবেন? জানেন মিঃ সাহা, সেদিন আপনি সব কথা আমাদের না বললেও ঐ মিতুলবাবু কিন্তু ঠিক ধরেছিল যে, যে নস্যির-কৌটোটা আপনার হারিয়েছে, সেটা সামান্য একটা নস্যির-কৌটো নয়—ওর অনেক মূল্য— নইলে আপনি আমার সাহায্যের জন্য ছুটে যেতেন না।"

"তাই নাকি? আশ্চর্য!" রাঘবেন্দ্র এবারে বললেন।

"আমারও অবিশ্যি ঐ ধরনেরই একটা কথা মনে হয়েছিল আপনার ঐ নকল কৌটোটা পরীক্ষা করে, এবং তাই আমি আপনার কৌটো উদ্ধারের ব্যাপারে চেষ্টা করতে সম্মত হয়েছিলাম।"

"আপনার কি মনে হয় মিঃ সেন, কৌটোটা আপনি উদ্ধার করতে পারবেন?"

রাঘবেন্দ্র সাহার গলার স্বরটা যেন কেমন কান্নায় জড়ানো মনে হলো আমার।

"মিঃ সাহা," বিরূপাক্ষ আবার বললে, "এই এতক্ষণ আজ আপনাকে দেখছি, এবং যেদিন আমার বাড়িতে গিয়েছিলেন সেদিনও ঘণ্টাখানেক দেখেছি, কিন্তু কই, সেদিনও যেমন দেখিনি, আজো তেমন একটা দেখছি না আপনাকে নস্যি নিতে—"

"নস্যি তো আমি নিই না।"

"নেন না নস্যি?"

"না, বাবা নিতেন, কিন্তু ঐ চাবিটার জন্যই সর্বদা কৌটোটা আমার হাতে রাখতাম।"

"এখন বুঝতে পারছি, কৌটোটা যে চুরি করেছে, আসল কৌটোটা কোন এক ফাঁকে সে হাত-সাফাই করবার সুযোগ পেয়েছিল। আপনার নস্যি নেওয়ার অভ্যাস থাকলে বোধহয় পারত না। যাক সে কথা, আপনার ঐ চাবিটার কথা আপনার কোন বিশেষ পরিচিতজন বা বন্ধু জানত?"

"না।"

"ভাল করে ভেবে দেখুন, কেউ জানত না?"

"না! সিন্দুকটার মধ্যে মূল্যবান সব জুয়েল থাকতো বলে ঐ চাবির ব্যাপারটা আমি সযত্নে বরাবর গোপন রেখেছি। এমন কী, কখনো দরজা না বন্ধ করে সিন্দুকটাও খুলিনি।"

"তবু আমার মনে হয়—"

"কী মনে হয় আপনার মিঃ সেন?"

"দ্বিতীয় কোনও লোক, যে-ভাবেই হোক, ব্যাপারটা জানতে পেরেছিল।"

"কেমন করে জানবে তাই তো বুঝতে পারছি না।" রাঘবেন্দ্র সাহা জবাবে বললেন।

"সিন্দুকটা বোধহয় আর খুলতেও পারেননি এই কয়দিন?"

"না, পরের দিনই, মানে সেই পার্টির পরের দিন সকালে, সিন্দুকটা খুলতে গিয়ে ব্যাপারটা আমি জানতে পারি, তারপর থেকে আর আমি দোকানে যাইনি বা এই ঘর থেকে বের হইনি পাছে কেউ এসে সিন্দুকটা খোলে।"

"আমার ওখানে সেদিন যখন গিয়েছিলেন—" বিরূপাক্ষ বলে।

"ঘরে তালা দিয়ে গিয়েছিলাম, এসে আবার নিজে তালা খুলি।"

"তা-ই যদি হয় তো—"

"কী মিঃ সেন?"

"কৌটোটা যে চুরি করেছে বা হাতসাফাই করেছে, সে এখনো আপনার সিন্দুকটা খুলতে পারেনি।"

"বলছেন আপনি?"

"হ্যাঁ, অন্তত এইটুকু বুঝতে পারছি, সিন্দুকের থেকে কিছু এখনো খোয়া যায়নি, এবং এও মনে হচ্ছে যে, অপহরণকারী ব্যাপারটা জানত বলেই অবিকল আসল কৌটোটির মত একটি কৌটো তৈরি করে সেটা আসলের সঙ্গে বদল করেছে।"

"কাকু—"

হঠাৎ মিতুলবাবুর কণ্ঠস্বরে বিরূপাক্ষ ফিরে তাকাল তার দিকে। বললে, "কী ব্যাপার মিতুলবাবু?"

"তাহলে সেই চোর নিশ্চয়ই আসবে একদিন সিন্দুক খুলতে, তাই না?"

"হ্যাঁ—"

"কাকু, দ্যাখো দ্যাখো ঐ মরা বাঘটা কেমন সামনের দুটো পা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে, আশ্চর্য না?"

সামনের দুটো থাবার একটা থাবাও টেবিলটার উপরে নেই, কেমন করে দাঁড়িয়ে আছে কেবল পিছনের দু পায়ে মরা বাঘটা।

মিতুলবাবুর কথায় আমি ও বিরূপাক্ষ দুজনেই বাঘের মূর্তিটার দিকে তাকিয়ে ছিলাম। বিরূপাক্ষ সেই মূর্তিটার দিকে ক্ষণকাল তাকিয়ে থেকে বললে, "তাই তো!"

বিরূপাক্ষ এগিয়ে গেল। আমিও ওকে অনুসরণ করি।

রাঘবেন্দ্র সাহাও এলেন। তিনি বললেন, "একটা পা বাঘটার বরাবরই তোলা ছিল, কিন্তু অন্য পাটা..."

রাঘবেন্দ্রর কথা শেষ হলো না, মিতুলবাবু হঠাৎ এগিয়ে গিয়ে একটা পায়ের নীচ থেকে কী যেন একটা টেনে বের করল, "দ্যাখো দ্যাখো, কাকু, আর-একটা নস্যির-কৌটো!"

"দেখি-দেখি," রাঘবেন্দ্রবাবু ছিনিয়েই নিলেন যেন মিতুলবাবুর হাত থেকে কৌটোটা। "এই তো, এই তো আমার আসল কৌটো, আপনারা একটু দাঁড়ান, আমি চট্ করে একবার দেখে আসি এর চাবিটা দিয়ে সিন্দুকটা খোলে কিনা।"

বিরূপাক্ষ বাধা দিল। "ব্যস্ত হবেন না মিঃ সাহা, ওটা দিয়ে খুলবে।"

"খুলবে?"

"হ্যাঁ, কারণ চোর সেরাত্রে কৌটোটা হাতসাফাই করলেও কৌটোটা নিয়ে সরে পড়তে পারেনি। তাই ওটা ওইখানে রেখে গিয়েছিল। মনে করে দেখুন তো সে-রাত্রে ঐ বাঘটার সামনে কে কে গিয়েছিল। তাহলেই হয়তো আপনি চোরকে সনাক্ত করতে পারবেন।"

"দরকার নেই, কৌটোটা তো পেয়ে গিয়েছি।"

"পেয়েছেন বটে, তবে ভবিষ্যতের কথা তো বলা যায় না। সে যে আবার দ্বিতীয়বার চেষ্টা করবে না তা কে বলতে পারে।"

রাঘবেন্দ্র বললেন, "সাবাস বাহাদুর ছেলে, তোমাকেও আমি পুরস্কার দেবো।"

ছবি এঁকেছেন ॥ সুধীর মৈত্র

বিমল কর

কাপালিকেরা এখনও আছে

উপন্যাস

আগে যা ঘটেছে

একদিন একেবারে আচমকা তারাপদ সলিসিটার মৃণাল দত্তের কাছ থেকে এক চিঠি পায়। চিঠি পড়ে মনে হল, ভুজঙ্গভূষণ হাজরা নামের এক ভদ্রলোকের দেড় দু লাখ টাকার সম্পত্তি তারাপদর ভাগ্যে নাচছে। পদবী থেকে অনুমান হয়, তিনি তারাপদর এক পিসেমশাই। তারাপদ তার ডাক্তার-বন্ধু চন্দনকে নিয়ে মৃণাল দত্ত-র বাড়িতে দেখা করতে গেল সেদিনই সন্ধে বেলায়। মৃণাল দত্ত ভুজঙ্গভূষণের ঠিকানা দিলেন। মধুপুরের কাছে শঙ্করপুরে ভুজঙ্গভূষণ থাকেন। কিছুদিন আগে তাঁর এক দুর্ঘটনা ঘটেছে, তিনি মরণাপন্ন।

সেদিন রাত্রেই তারাপদ চন্দনকে সঙ্গে নিয়ে হাওড়া স্টেশন থেকে গাড়িতে উঠল। গাড়িতে আলাপ হল এক মজার মানুষের সঙ্গে, নাম তাঁর কিঙ্করকিশোর রায়, ছোট করে 'কিকিরা'। তারাপদরা কিকিরাকে প্রথমে সন্দেহ করতে লাগল। পরে সে-সন্দেহ দূর হল। মনে হল, কিকিরা তাদের বন্ধু।

শঙ্করপুরে ভুজঙ্গভূষণের বাড়িতে এসে তারাপদরা দেখল, বাড়িটা একটা দুর্গ। সেখানে তারাপদ তার পরিচিত সাধুমামাকে দেখতে পেল। কিন্তু সাধুমামা তারাপদকে চিনতে পারলেন না যেন, কথাও বললেন না। বোবা হয়ে থাকলেন।

সন্ধেবেলায় এক রহস্যময় ঘরে আরও রহস্যজনক অবস্থায় ভুজঙ্গভূষণের সঙ্গে দেখা হল। এই ঘরে তিনি মৃতজনের আত্মাকে ডেকে নিয়ে আসেন। এই রকম এক আত্মা এসে বিচিত্র এক কাণ্ড করল। একটা রঙীন বল শূন্যে লাফাতে লাফাতে ঘরময় ঘুরে বেড়াল। তারাপদরা এই দৃশ্য দেখে ভয় পেয়ে গেল।

পরের দিন আবার সেই রহস্যময় ঘরে ভুজঙ্গভূষণ তারাপদর মা-বাবার আত্মাকে হাজির করালেন। কিন্তু তারাপদ এতই বিচলিত হয়ে পড়ল যে, সেই চক্র ভেঙে গেল।

॥ আট ॥

সকালে তারাপদর চেহারা দেখে চন্দন বেশ ঘাবড়ে গেল। মুখ কেমন থমথম করছে তারাপদর, উদাস চোখ, বার বার নিঃশ্বাস ফেলছে শব্দ করে, কিসের এক দুঃখ যেন তার সমস্ত মুখ ম্লান করে রেখেছে। কথাবার্তা বলতেও তার তেমন ইচ্ছে করছিল না। আপন মনে কত কী যে ভাবছে তারাপদ, কে জানে!

চন্দন বুঝিয়ে সুঝিয়ে বলল, "তুই এত মুষড়ে পড়লে চলবে কেন? কী হয়েছে তোর?"

তারাপদ চুপচাপ, কথার জবাবই দেয় না, শেষে বলল, "কাল আমার মা এসেছিল। একবার যদি দেখতে পেতাম...!"

চন্দন বলল, "তুই সত্যিই বিশ্বাস করিস মাসিমা এসেছিলেন?"

"তুই করিস না?"

চন্দন বুঝতে পারছিল না, বিশ্বাস করা উচিত নাকি উচিত নয়। সে বিশ্বাস করতেও চাইছে না, আবার অবিশ্বাস করারও জোর পাচ্ছে না।

তারাপদ ধরা-ধরা গলায় বলল, "মার সঙ্গে বাবাও এসেছিল, চাঁদু। আমার বাবা। স্কুলে যখন ক্লাস এইটে পড়ি, সেই সময় বাবা মারা গেছে; এত বছর পরে বাবা এসেছিল...; ইস্, আমি যে কী করলাম!"

তারাপদর চোখ ছলছল করে উঠল; ঠোঁট কাঁপতে লাগল।

চন্দন বুঝতে পারল না কী বলবে। তার খারাপ লাগছিল। মা-বাবার জন্যে বন্ধুর এই দুঃখ সে বুঝতে পারে, কিন্তু কেমন করে সান্ত্বনা দেবে জানে না। মাথা চুলকে চন্দন বলল, "তারা, এমন তো হতে পারে এ সবই মিথ্যে।"

তারাপদর ভাল লাগল না কথাটা। বন্ধুর দিকে ক্ষোভের চোখে তাকাল। বলল, "মিথ্যে?"

"কিকিরা তো তাই বলেছেন।"

"কিকিরা যা বলবেন তাই সত্যি হবে? বেশ, তুই বল—এটা কেমন করে সম্ভব হল? আমি ওই মেয়েটার একটা হাত আর একটা পা ছুঁয়ে রেখেছিলাম। একবারও ছাড়িনি। তুইও ছুঁয়ে ছিলি। ঠিক কি না?"

"হ্যাঁ।"

"তা হলে ঘন্টাটা কেমন করে বাজল? কে বাজাল?"

চন্দন জবাব দিতে পারল না। সে এই ব্যাপারটা নিয়ে কাল রাত থেকেই ভেবেছে, ভেবে কোনো কূল-কিনারা পায়নি। এক যদি এমন হয় যে, ওই ঘুটঘুটে

অন্ধকার ঘরে কেউ লুকিয়ে এসে ঘণ্টাটা বাজিয়ে দিয়ে যায়! কিন্তু তা কেমন করে সম্ভব? লোকটা আসবে, বাজাবে, চলে যাবে—আর তারা দুজনে কিছুই বুঝতে পারবে না?

চন্দন বলল, "আমিও বুঝতে পারছি না। আচ্ছা তারা, ঘণ্টা যেটা বেজেছিল সেটা আমাদের টেবিলের তলায় ছিল—সেটা ঠিক তো?"

"নিশ্চয়। কেন, তোর সন্দেহ হচ্ছে?"

"না, আমারও হচ্ছে না। তবু তোকে কাল যা বলছিলাম রাত্রে, কেউ যদি লুকিয়ে এসে বাজিয়ে দিয়ে যায়—?"

"বাজে কথা বলিস না। অত অন্ধকারে এসে ঘণ্টা খুঁজে বাজিয়ে দিয়ে যাবে—আর আমাদের গায়ে পায়ে কোথাও তার ছোঁয়া লাগবে না—তা কি হয়? তুই একটা জিনিস ঠিক জানবি, যতই অন্ধকার থাকুক, তোর গায়ের পাশে কেউ যদি এসে দাঁড়ায় তুই নিশ্চয় বুঝতে পারবি। বাই ইনস্‌টিংক্ট।"

চন্দন অস্বীকার করতে পারল না।

তারাপদ বলল, "তারপর আমরা হাত ছেড়ে দেবার সঙ্গেসঙ্গেই প্রায় বাতি জ্বলে উঠেছিল। যদি কেউ এসে থাকে—অত তাড়াতাড়ি পালাবে কোথায়?"

স্বীকার করে নিল চন্দন। এমন সব রহস্যময় কাণ্ড পরপর দু দিন তারা দেখল যে, কোনো রকমেই তা ব্যাখ্যা করা যাচ্ছে না। তা হলে কি সত্যিই আত্মা আছে? মানুষ মারা যাবার পর এই জীবলোকে না-থাকলেও অন্য কোনো জায়গায় থাকে? মানে তাদের আত্মা থেকে যায়? হাজার হাজার বছর ধরে কত মানুষ এই জগতে এসেছে, চলে গেছে। সবাই কি তা হলে অন্য কোনো জগতে—অন্য কোনো লোকে আছে? কোটি কোটি আত্মা সেখানে কেমন করে আছে?

বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করল না চন্দনের। সে ডাক্তার। মানুষ একটা বিচিত্র যন্ত্রের মতন, কে জানে ভগবান কেমন করে এই যন্ত্র তৈরি করেছিলেন, কিন্তু এই যে যন্ত্র, এর কোনো তুলনা নেই, চাঁদে যাওয়ার চেয়েও এ অনেক রহস্যময়। সেই যন্ত্র যখন অচল হয়ে যায় কোনো কারণে, তখনই মৃত্যু। তারপর আর কিছু থাকতে পারে না।

থাকতে পারে না; কিন্তু এ-সব কেমন করে হচ্ছে? চন্দন অতশত আর ভাবতে পারল না। বলল, "নে ওঠ, কিকিরার সঙ্গে দেখা করার সময় হয়ে গেছে।"

তারাপদ এতই মুষড়ে পড়েছিল যে, কিকিরার কাছে যাবার জন্যে গা করল না। বলল, "আমার আর ভাল লাগছে না। তুই যা।"

চন্দন অবাক হয়ে বন্ধুকে দেখতে লাগল। "তুই যাবি না মানে?"

"আমার ইচ্ছে করছে না।"

"কিন্তু কিকিরা এই ব্যাপারটা আমাদের বুঝিয়ে দিতে পারেন।"

"মুখে অনেক কিছু বুঝিয়ে দেওয়া যায়, চাঁদু—" তারাপদ বলল, "মন তা মানতে চায় না।"

চন্দন বন্ধুর এই ভেঙেপড়া ভাব পছন্দ করল না। বলল, "তুই এখানে বসে থেকে কী করবি একলা-একলা। তার চেয়ে কিকিরার কাছে চল। কিকিরাকে সব বলি। আমার তো মনে হয় কিকিরার পরামর্শ খুব দরকার এখন।"

তারাপদ বলল, "তুই যা। আমি একবার সাধু-মামাকে ধরবার চেষ্টা করি। সাধুমামা আমার মা-বাবার কথা সবই জানে। দেখি, সাধুমামাকে দিয়ে যদি কোনো কথা বলাতে পারি।"

চন্দন কী ভেবে তারাপদর কথায় রাজী হয়ে গেল। তারাপদ যদি সাধুমামাকে দিয়ে দু-চারটে কথা বলাতে পারে, ভালই হবে। চন্দন বলল, "ঠিক আছে, তুই এই বাড়ির দিকটায় নজর রাখ, সাধুমামাকে যদি ধরতে পারিস ধর; আমি কিকিরার সঙ্গে দেখা করে আসি। এ-বাড়িতে সাইকেল আছে। একটা সাইকেল বাগিয়ে এক চক্কর ঘুরে আসতে পারলে ভাল হয়। চল, দেখি কী করা যায়।"

দুই বন্ধু বাগানের রোদে পায়চারি করতে করতে মৃত্যুঞ্জয়কে খুঁজতে লাগল।

চন্দন একটা সাইকেল জুটিয়ে চলে গেছে অনেকক্ষণ। তারাপদ সেই বাগানেই ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে শেষ পর্যন্ত পেয়ারা গাছের ছায়ায় এসে বসে ছিল। মৃত্যুঞ্জয় আজ তারাপদর সঙ্গ ছাড়তে চাইছিল না। গায়ে যেন লেপটে ছিল অনেকক্ষণ। বোধ হয় চন্দনকে একটা সাইকেল তাড়াতাড়ি জুটিয়ে দিয়ে সে তারাপদকে একলাই পেতে চাইছিল।

তারাপদ নিরীহ, সরল মানুষ। হয়ত অনেক সময় বোকামি করে ফেলে। কিন্তু মৃত্যুঞ্জয় লোকটাকে দেখা পর্যন্ত তার মন যেরকম বিগড়ে আছে, তাতে সে লোকটার সঙ্গে মেলামেশা করতে চাইছিল না। তা ছাড়া মানুষ যাকে সন্দেহ করে, তার কাছে মনখোলা হয় না, হতে পারে না। তারাপদ একেবারে বোকা নয়, সে মৃত্যুঞ্জয়ের উদ্দেশ্য জানে না যদিও, তবু খুব সাবধানে কথাবার্তা বলতে লাগল। কথাবার্তা বলতে বলতে বুঝল, লোকটা যতই ধূর্ত শয়তান হোক, তার মনের ইচ্ছেটা একেবারে গোপন রাখতে শেখেনি। মৃত্যুঞ্জয় চায় না, তারাপদ এ-বাড়িতে বেশীদিন থাকে। হ্যাঁ—, কথাবার্তা থেকে সেই রকমই আঁচ করল তারাপদ।

বেলা আরও বেড়ে উঠল। শীতের রোদ মাথা-গা তাতিয়ে যখন কপালে ঘাম ফোটাতে লাগল, তারাপদ তখন পেয়ারাতলায় একা-একা বসে একটা সিগারেট শেষ করল। এদিক ওদিক তাকিয়েও সে সাধুমামাকে কোথাও দেখতে পেল না। বাগান ফাঁকা। একটা দেহাতী মালী কিছু কাজকর্ম করছিল বাগানের একপাশে—সব্জি-বাগানে; সেও চলে গেছে। ডায়নামোটা আর চলছে না। শব্দ নেই। আকাশ একেবারে নীল। চিলটিল উড়ছে অনেক উঁচুতে।

তারাপদ বারবার তার মা-বাবার কথা ভাবছে। বেচারী বাবা, দুঃখী মা। মা যে কত কষ্ট করে তাকে মানুষ করেছিল, তারাপদই জানে। মা-বাবা বেঁচে থাকলে আজ কি তারাপদর এমন অবস্থা হত?

পেয়ারাতলা ছেড়ে তারাপদ উঠে পড়ল। ভাল লাগছে না। কেন সে এখানে এল? না এলে এমন করে তাকে দুঃখ পেতে হত না। মা-বাবাকে তো সে ভুলেই গিয়েছিল, ভুজঙ্গ নতুন করে সেই দুঃখ জাগিয়ে তুলল। শুধু জাগিয়ে তুলল না, তারাপদর এখন থেকে বারবার মনে পড়বে—তার বাবা, মা, বোন—সকলেই যেন আকাশে-বাতাসে কোথাও আছে, কোনো ছায়ালোকে, অদৃশ্য আত্মা হয়ে।

অন্যমনস্কভাবে হাঁটতে হাঁটতে তারাপদ আস্তাবলের কাছে আসতেই হঠাৎ তার নজরে পড়ল, খানিকটা তফাতে টালির একটা ভাঙাচোরা ঘরের একপাশে আতা-ঝোপের দিকে সাধুমামা দাঁড়িয়ে। কী যেন করছিল সাধুমামা।

তারাপদ একবার চারপাশে তাকাল। কাউকে দেখতে পেল না। আস্তাবলে ঘোড়া নেই। সহিস বোধ হয় ঘোড়া নিয়ে মাঠে গিয়েছে।

প্রায় চোরের মতন তারাপদ সাধুমামার কাছাকাছি এসে দাঁড়াল। ততক্ষণে সাধুমামা তারাপদকে দেখতে পেয়ে গেছেন।

সাধুমামা তারাপদকে দেখে ভয়ের চোখে চারপাশে তাকালেন, যেন কেউ তাঁকে দেখে ফেলবে।

তারাপদ বলল, "সাধুমামা!"

আতা-ঝোপের আড়ালে মাটিতে বসে পড়লেন সাধু-মামা, চোখে ভয়, সারা মুখে উদ্বেগ। ইশারায় তারাপদকে বসে পড়তে বললেন।

তারাপদ বসল। বসে একদৃষ্টে সাধুমামার দিকে তাকিয়ে থাকল। তারপর বলল, "সাধুমামা, তুমি বোবা সেজে রয়েছ কেন?"

সাধুমামা জবাব দিতে পারলেন না। তাঁর গলার শিরা ফুলে উঠল, মুখ কেমন কালচে হয়ে এল, জল এসে পড়ল চোখে। তারপর চাপা গলায়, ভাঙা ভাঙা স্বরে, জড়িয়ে জড়িয়ে বললেন, "প্রাণের ভয়।" বলতে বলতে সাধুমামা তাঁর রোগা হাত কপালে তুললেন। তাঁর হাত কাঁপছিল থরথর করে। শিরাগুলোই চোখে পড়ে, বিন্দু-মাত্র মেদ-মাংস যেন হাতে নেই, হাড় ফুটে আছে। সাধু-মামার গলার স্বর থেকেই বোঝা যায়, তাঁর গলা কী বিশ্রী খসখসে হয়ে গেছে, জিবের কোনো দোষ হয়েছে তাঁর, কথা জড়িয়ে যায়।

তারাপদর কান্না পাচ্ছিল। বেচারী সাধুমামা। যেভাবে সাধুমামা বেঁচে আছেন, তা প্রায় মরে যাবারই সামিল। তারাপদ বলল, "ভুজঙ্গ তোমায় মেরে ফেলবে?"

"মারতে চেয়েছিল। পারেনি।" টেনে-টেনে জড়িয়ে-জড়িয়ে সাধুমামা বললেন।

"কেন?"

"আমি ওর বাধা হয়ে পড়েছিলাম।"

"কিন্তু তুমি আমাদের সব খবরাখবর ওকে দিয়েছ। আমাদের ছবি দিয়েছ।"

"দিয়েছি, বাবা। তখন ওকে বুঝিনি। ও আমায় বশ করে রেখেছিল। আমি তোমাদের ভালই চেয়ে-ছিলাম। পরে বুঝলাম, ও একটা পাপী, নরকেও ওর

জায়গা নেই। পশু...পশু...একেবারে পশু।" সাধুমামা অনেক কষ্ট করে কথাগুলো বললেন। বলতে তাঁর কী পরিশ্রম যে হচ্ছিল, তারাপদ বুঝতে পারল।

"কথা বলতে তোমার বড় কষ্ট হয়, না?"

"হ্যাঁ। বড় কষ্ট।"

"তুমি আমায় একটা কথা বলো সাধুমামা। ভুজঙ্গ কি আত্মা নামাতে পারে?"

সাধুমামা কিছু বলার আগেই মৃত্যুঞ্জয়কে তারাপদ দেখতে পেল। সঙ্গে-সঙ্গে তার বুক ধক্ করে লাফিয়ে উঠল যেন। সর্বনাশ। মৃত্যুঞ্জয় যদি তাদের দেখতে পায়, সাধুমামার ভীষণ অবস্থা হবে। তারাপদ ভয়ে কাঠ হয়ে বলল, "সাধুমামা, মৃত্যুঞ্জয়।"

মৃত্যুঞ্জয়ের নাম শোনামাত্র সাধুমামা আতা-ঝোপের আড়ালে শুয়ে পড়লেন। শুয়ে পড়ে হাত-পা গুটিয়ে কুণ্ডলী হয়ে গড়াতে গড়াতে আরও হাত কয়েক দূরে সরে গেলেন। জায়গাটা আরও ঝোপেঝাড়ে ভরা, বুনো তুলসীর ঝোপ, কাঁটা-ঝোপ, তারই মধ্যে এক ধরনের বুনো লতা গাছপালার গা জড়িয়ে জড়িয়ে বেড়ে উঠেছে। সাধুমামা ইশারায় তারাপদকে চলে যেতে বললেন।

তারাপদ আড়াল থেকে মৃত্যুঞ্জয়কে লক্ষ করতে লাগল। সামান্য সময় লক্ষ করার পর দেখল, মৃত্যুঞ্জয় অন্যদিকে চলে যাচ্ছে। বাড়ির ভেতরেই যাচ্ছে।

তারাপদ বসে বসেই বলল, "সাধুমামা, কাল ভুজঙ্গ আমার মা-র আত্মাকে এনেছিল। বাবাও এসেছিল। আমি গোলমাল করে ফেলায় সব নষ্ট হয়ে গেল। ভুজঙ্গ কেন আমার মা-বাবাকে এনেছিল? সত্যিই কি তারা এসেছিল?"

সাধুমামা হাত নেড়ে তারাপদকে চলে যেতে ইশারা করছিলেন। বললেন, "ভুজঙ্গ তোমায় এইখানে এ-বাড়িতে আটকে রাখতে চায়। সারা জীবনের মতন। তোমাকেও সে ভুজঙ্গ করতে চাইছে। খবরদার, তুমি থেকো না। এই সম্পত্তির জন্যে নিজের সর্বনাশ তুমি করো না, বাবা। তুমি পাপী হয়ো না। এ বড় পাপের জিনিস। ...যাও, আর এখানে থেকো না। উঠে যাও। পরে কথা বলব।"

তারাপদ কয়েক মুহূর্ত বসে থেকে সাধুমামাকে দেখল। অবশ্য সাধুমামাকে দেখা যাচ্ছে না আর, আড়ালে মাটিতে শুয়ে আছেন, এমনভাবে কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে আছেন যে, মুমূর্ষু জন্তুর মতন দেখাচ্ছে।

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে তারাপদ উঠে দাঁড়াল। তারপর ধীরে-ধীরে নিজের ঘরের দিকে এগিয়ে চলল।

আরও খানিকটা বেলায় চন্দন ফিরল।

তারাপদ তার বিছানায় শুয়ে ছিল ছাদের দিকে তাকিয়ে। খোলা জানলা দিয়ে রোদ আসছে না, কিন্তু আলো আসছিল। উজ্জ্বল আলো। এক জোড়া ভোমরা ঘরের মধ্যে উড়ছে, জানলা দিয়ে বাইরে চলে যাচ্ছে, আবার কখন এসে ঘরে ঢুকে পড়ছে। শেষ পর্যন্ত তারা উড়ে গেল বাইরে। তারাপদও নিশ্চিন্ত বোধ করল।

চন্দন এসে বলল, "তারা, তুই না-যাওয়ায় কিকিরা খুব ঘাবড়ে গিয়েছেন।"

"কেন?"

"কিকিরা ভয় পাচ্ছেন, তুই না শেষ পর্যন্ত ভুজঙ্গর খপ্পরে পড়ে যাস।"

তারাপদ তেমন খুশী হল না; বলল, "খপ্পরে পড়ে যাবার কী দেখলেন উনি?"

চন্দন বলল, "তুই আত্মা-নামানোর ব্যাপারে বিশ্বাস করে ফেলেছিস। ভুজঙ্গ এই চাল দিয়ে তোকে বাগিয়ে ফেলবে।"

"মানে?"

"মানে এর পর ভুজঙ্গ যা বলবে—তুই তাই করবি।"

তারাপদ হঠাৎ যেন কেমন রেগে উঠল। বলল, কিকিরা যা বলবেন তাই মেনে নিতে হবে? উনি মুখেই বলছেন—কাজে কিছু দেখাতে পারছেন? বোঝাতে পারছেন? কালকের ব্যাপারটা কেমন করে হল—কিকিরা আমায় বোঝান, তারপর অন্য কথা।"

চন্দন বলল, "কিকিরা বললেন, ঘরে কোনো আত্মা-টাত্মা নামেনি। এটা ওই মেয়েটিরই কাজ।"

তারাপদ এত অবাক হয়ে গেল যে, কিছুক্ষণ কথাই বলতে পারল না। তারপর বলল, "কী বাজে কথা বলছিস তুই? মেয়েটি কেমন করে ঘণ্টা বাজাবে। আমরা তার হাতে হাত রেখে বসে ছিলাম, আমাদের পা তার পা ছুঁয়ে ছিল। তুই কি বলতে চাস মেয়েটার আরও একটা লুকোনো হাত ছিল? বাজে বকিস না চাঁদু।"

চন্দন বলল, "কিকিরাকে আমি সে-কথা বলেছিলাম। উনি বললেন, হাতে হাত রাখা, পায়ে পা ছোঁয়ানো সবই ঠিক—কিন্তু ওরই মধ্যে কোথাও একটা ভেলকি আছে।"

"ভেলকি আছে বললেই তো চলবে না, তার প্রমাণ কী?"

"কোনো প্রমাণ নেই, মানে আমরা কাল ধরতে পারিনি। ওইভাবে ঘুটঘুটে অন্ধকারে বসিয়ে আত্মা নামালে লোকে সমস্ত ব্যাপারটায় এত অবাক হয়ে যায় যে, ভেতরে ভেতরে কী হচ্ছে খেয়াল করে না। মেয়েটা যদি কোনো চালাকি করে থাকে আমরা ধরতে পারিনি।"

"কোনো চালাকি করেনি," তারাপদ বলল।

চন্দন একটু চুপ করে থেকে বলল, "ঠিক আছে। আজ যদি আবার ওই মেয়েটা আসে আমিও তক্কে তক্কে থাকব।"

"থাকিস।"

চন্দন বেশ বুঝতে পারল, তারাপদ তার মা-বাবার আত্মা আসার ব্যাপারটা বিশ্বাস করে নিয়েছে প্রায়। না, বন্ধুর সে দোষ ধরছে না। মানুষের এই দুর্বলতায় দোষ ধরা যায় না। কিকিরাও বলেছেন, ভুজঙ্গ তারাপদর দুর্বল জায়গায় ঘা মারছে, এই ঘা দিয়েই সে তারাপদকে বশ করবে, তাকে নিজের মুঠোয় এনে ফেলবে। চন্দন যে কেমন করে বন্ধুকে ভুজঙ্গর হাত থেকে বাঁচাবে বুঝতে পারছে না। কিকিরা বলেছেন, আপনি স্যার এখন থেকে আরও সজাগ থাকবেন, আরও নজর রাখবেন সব ব্যাপারে।

চন্দন আজ খুব সতর্ক থাকবে। আজ সে দেখবার চেষ্টা করবে কেমন করে আত্মা আসে, কেমন করে ঘণ্টা বাজে। কিকিরা তাকে একটা জিনিস দিয়েছেন। ছোট্ট জিনিস, লুকিয়ে রাখা যায়। চন্দন আজ যখন ওপরের ওই ভুতুড়ে ঘরে যাবে—তখন জিনিসটা লুকিয়ে নিয়ে যাবে কাপড়ের মধ্যে। চন্দনের ইচ্ছে ছিল, ইনজেকশনের ছুঁচটা লুকিয়ে নিয়ে যাবার। যদি সে দেখত, বা তার সন্দেহ হত, আত্মার নাম করে আশেপাশে কেউ ঘোরাঘুরি করছে, তবে একবার ছুঁচটা ফুটিয়ে দিত গায়ে। আত্মা হলে নিশ্চয় ছুঁচ ফুটত না, বাতাসে কি আর ছুঁচ ফোটে? কিন্তু কোনো মানুষ হলে, সে যেমনই মানুষ হোক, আচমকা ছুঁচ ফুটলে উঃ করে উঠত। আর তখনই ব্যাপারটা জানা যেত। বোঝা যেত, ভুজঙ্গ আত্মা নামায়

না মানুষ নামার।

চন্দন বিছানায় শুয়ে এই সব ভাবতে লাগল. আর তারাপদ বসল দাড়ি কামাতে।

দাড়ি কামাতে কামাতে তারাপদ বলল, "চাঁদু, সাধু-মামার সঙ্গে আজ আমার কথা হয়েছে।"

চন্দন তাকাল।

তারাপদ বলল, "সাধুমামাকে আমি দু-চারটে কথা জিগ্যেস করেছি—এমন সময় মৃত্যুঞ্জয়কে দেখতে পেলাম। বেশী কথা হল না। সাধুমামা কথা বলতে পারে—কিন্তু কেমন জড়িয়ে-জড়িয়ে। খুব কষ্ট হয়। সাধুমামা আমায় বলল, ভুজঙ্গ আমায় এইখানে আটকে রাখতে চায়। কেন বল তো?"

চন্দন বলল, "কিকিরাও তাই বললেন।"

"কিন্তু কেন?"

"ভুজঙ্গ মারা যাবার পর তুই আর-এক ভুজঙ্গ হয়ে থাকবি বলে।"

"আমি কেন ভুজঙ্গ হয়ে থাকব?"

"ভুজঙ্গই তোকে সে-কথা বলবে। আমি কেমন করে জানব!"

সন্ধেবেলায় আবার সেই আত্মা-নামানোর ঘরে তারাপদরা এসে বসল। তেমনই অন্ধকার ঘর, মিটমিটে আলো জ্বলছে গুটি দুই, সেই একই ভাবে টেবিল-চেয়ার সাজানো, বাড়তির মধ্যে আরও একটা নিচু ধরনের টেবিল ভুজঙ্গর কাছাকাছি রাখা, তার ওপর দু-একটা জিনিস; গোল বয়ামের মতন দেখতে।

তারাপদরা বসে থাকল তো বসেই থাকল। ঘরের সেই অন্ধকারে চোখ যেন নরম হয়ে আসছিল। গন্ধও আজ চমৎকার লাগছিল, কেমন একটা আবেশ আসছিল। হঠাৎ চন্দন উঠে পড়ে তারাপদকে তার চেয়ারে আসতে বলল। তারাপদ কিছু বুঝল না। কিন্তু চেয়ার বদল করল।

চন্দন ঘরের চারপাশ খুঁটিয়ে দেখবার চেষ্টা করতে লাগল। পর পর তিন দিন এই ঘরে এল তারা। এখন খানিকটা অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে। প্রথম দিনের মতন অতটা গা ছমছম করে না। চন্দন দেখল, এই ঘরের বাইরে মন একরকম থাকে—কিন্তু ঘরটায় ঢুকলেই ধীরে ধীরে কেমন যেন অন্যরকম হয়ে যায়। সেই বেড়ালটাকেও চন্দন দেখল। চোখের মণি দুটো জ্বলছে।

আরও খানিকটা পরে ভুজঙ্গভূষণ এলেন। তাঁর মাথার ওপরকার চোরা লাল আলো জ্বলে উঠল। ঘরের অন্য বাতি দুটো নিবে গেল সঙ্গে-সঙ্গে। ভুজঙ্গভূষণের একই বেশ : রক্তগৈরিক বসন, মুখের ওপর সেই মুখোশ, গলায় বিশাল রুদ্রাক্ষমালা। তিনি এসে বসার পর সেই কালকের মতন স্তোত্র পাঠ হল। গ্রামোফোন রেকর্ডে যে-ভাবে গান হয়, সেইভাবেই। এই ঘরের কোথাও এই গান বাজাবার ব্যবস্থা আছে। ভেতর থেকে কেউ বাজায়, বন্ধ করে। যে বাজায় সে-ই বোধ হয় ঘরের আলো জ্বালায়। চন্দন আজ সমস্ত কিছু লক্ষ করতে লাগল।

স্তোত্রপাঠ শেষ হবার পর একেবারে স্তব্ধ সব। সেই স্তব্ধতা ভেঙে ভুজঙ্গভূষণ গম্ভীর স্বরে সংস্কৃতে কী-যেন মন্ত্রপাঠ করলেন। তারপর তারাপদকে বললেন, "তারাপদ, তুমি কি তোমার মা-বাবাকে আজ আবার ডাকতে চাও?"

তারাপদ সঙ্গে-সঙ্গে জবাব দিল. "হ্যাঁ।"

একটু থেমে ভুজঙ্গভূষণ বললেন, "কাল তুমি—তোমরা যা করেছ তাতে বড় ক্ষতি হয়েছে। ওই মেয়েটি—

যার মধ্যে দিয়ে তোমার মা-বাবার আত্মা এসেছিলেন—আচমকা তোমরা তার হাত থেকে হাত উঠিয়ে নেবার পর সে এক রকম অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল। অনেকক্ষণ পরে তার জ্ঞান আসে। খুব দুর্বল হয়ে পড়েছিল। মিডিয়ামদের স্নায়ু হল সূক্ষ্ম তারের মতন—একটুতেই গোলমাল হয়ে যায়।"

তারাপদ লজ্জা পেল। বলল, "আমি নিজেকে সামলাতে পারিনি।"

"তোমার মা-বাবার আত্মাও কষ্ট পেয়েছেন। তোমরা এখানকার মানুষ, তোমাদের বোঝার সাধ্য নেই এইভাবে আত্মাদের আসতে-যেতে কত কষ্ট হয়। ডাকলেই কি তাঁরা আসেন? না—না। অনেক সময় হাজার বার ডাকলেও আসেন না। আবার যখন আসেন, তখন তাঁরা নিজেরা না চলে যাওয়া পর্যন্ত বিদায় দিতে নেই, এতে তাঁদের আরও কষ্ট হয়। কাল তোমরা তাঁদের কষ্ট দিয়েছ। আজ তাঁরা আবার আসবেন কিনা আমি বলতে পারছি না।"

"আসবেন না?" তারাপদ ব্যাকুল হয়ে বলল।

"কেমন করে বলব!"

"আপনি ডেকে দিতে পারেন না?"

"চেষ্টা করি। দেখি।"

ভুজঙ্গভূষণ ঘণ্টা বাজালেন।

কয়েক মুহূর্ত পরেই সেই মেয়েটিকে দেখা গেল। ঘন কালো শাড়ি, কালকের মতনই, সিল্কের শাড়িই হবে: পায়ের দিকটা দেখা যাচ্ছে না, শাড়ি লুটোচ্ছে কার্পেটে। মাথায় এলো চুল, পিঠ পর্যন্ত ছড়ানো। মুখ বড় সাদা, অবশ্য লাল আলোয় কেমন লালচে দেখাল।

মেয়েটি ঘণ্টা উঠিয়ে নিয়ে টেবিলের কাছে চলে এল। একবার শুধু তারাপদ আর চন্দনকে দেখল। ওর দুই চোখ কেমন টানা টানা ছোট দেখাল, যেন ঘুম জড়িয়ে আছে।

কালকের মতন করেই বসল তিন জনে গোল টেবিল ঘিরে। মেয়েটির একটা ছড়ানো হাতের ওপর তারাপদর হাত, আঙুলে আঙুল ছোঁয়ানো, অন্য হাতটি চন্দনের দিকে বাড়ানো। চন্দন তার হাত এমন করে মেয়েটির আঙুলে ছুঁইয়ে রাখল যেন একটু হাত কাঁপলেই সে বুঝতে পারে। পায়ে পা ছোঁয়ানো থাকল। চন্দন বুঝতে পারল না, মেয়েটির পায়ের আঙুল এত শক্ত কেন? হাড়-হাড় বলেই হয়ত।

ঘর অন্ধকার হয়ে গেল। ঘুটঘুটে অন্ধকার।

ভুজঙ্গ বললেন, "তারাপদ, একমনে নির্বিষ্টচিত্তে ওঁদের ডাকো।"

তারাপদ চোখ বুজে মা-বাবাকে ডাকতে লাগল। চন্দন চোখের পাতা বন্ধ করল না। তাকিয়ে থাকল। এই অন্ধকার যেন পাহাড়ের কোনো গুহার মধ্যের অন্ধকার, কিছুই দেখা যায় না, চোখের সাধ্য নেই এক বিঘত দূরের জিনিসও অনুমান করতে পারে।

ঘর একেবারে নিস্তব্ধ। নিঃশ্বাসের শব্দ ছাড়া কোনো শব্দ নেই।

সময় কেটে যেতে লাগল। চন্দনও যেন আর না-পেরে চোখের পাতা বন্ধ কর ফেলল।

তারাপদ অধীর হয়ে উঠছিল। মা-বাবা আজ কি আর আসবে না? কাতর হয়ে তারাপদ তার মা-বাবাকে ডাকতে লাগল।

সময় কেটে গেল আরও কতক্ষণ যেন। মনে হল, আজ আর কেউ আসবে না।

তারাপদ প্রায় যখন হতাশ হয়ে পড়েছে, তখন—ঠিক তখন ঘণ্টার মৃদু শব্দ হল।

ভুজঙ্গ সঙ্গে সঙ্গে বললেন, "কে, বেণু?"

ঘণ্টা বাজল না।

"বেণু, তুমি কি আসনি?"

কোনো শব্দ হল না।

ভুজঙ্গ এবার বললেন, "কে তুমি? বিষ্ণু নাকি?"

বিষ্ণু তারাপদর বাবার নাম, বিষ্ণুপদ নাম থেকে বিষ্ণু।

এবারও কোনো শব্দ হল না। ঘণ্টা বাজল না।

ভুজঙ্গ নিজেই যেন বিচলিত হয়ে পড়েছেন, বললেন, "তুমি কে? তারাপদর যদি কেউ না হও, সাড়া দাও।"

ঘণ্টা বাজল না।

ভুজঙ্গ কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষা করে বললেন, "তুমি কি তাহলে বেণুর মেয়ে?"

এবার খুব আস্তে করে ঘণ্টা বাজল।

তারাপদ কল্পনাই করেনি, তার সেই ছোট্ট বোন পরী আসবে। সেই পরী! কত ছোট্ট ছিল! কী সুন্দর ছিল! তার মাথার ঝাঁকড়া চুল আর ফুটফুটে গায়ের রঙ ছাড়া কিছুই আর মনে নেই তারাপদর। সিঁড়ি থেকে গড়িয়ে পড়ে মাথায় চোট লেগেছিল পরীর। মারা গেল। আহা রে!

তারাপদর সেই ছোট্ট বোন পরী আজ এসেছে। কিছুতেই নিজেকে সংযত রাখতে পারল না তারাপদ, ছেলেমানুষের মতন ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

(ক্রমশ)

ছবি এঁকেছেন ॥ শুভাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য

অঙ্কের মজা মজার অঙ্ক

শুভঙ্কর

তোমার বন্ধুকে বলো একটা কাগজে তার জন্মসন লিখতে। তোমাকে দেখাবে না একদম। এবার সংখ্যাটার রাশিগুলো যোগ করে নিতে বলো। যেমন, সে যদি জন্মসন লেখে ১৯৬১, তাহলে রাশিগুলোর যোগফল হবে ১+৯+৬+১=১৭।

এখন জন্মসন থেকে শূন্য ছাড়া অন্য যে-কোনো একটা সংখ্যা তাকে পছন্দ করতে বলো। যে-সংখ্যাটা পছন্দ হবে তোমার বন্ধুর, সেটা বাদ দিয়ে সংখ্যাটাকে আরেকবার লিখতে বলো। অর্থাৎ, আগের উদাহরণে, যদি ৬ তার পছন্দ-করা সংখ্যা ধরা যায়, তাহলে সে ৬ বাদ দিয়ে লিখবে ১৯১।

এবার, এই সংখ্যাটা থেকে তার আগের-করা যোগফল বিয়োগ দিতে বলো।

বিয়োগফলটা বলতে বলো তোমাকে। আর শোনামাত্র তুমি চটপট বলে দাও, কোন্ সংখ্যাটা পছন্দ করে বন্ধু আলাদা করে রেখেছে।

কী করে পারবে ভাবছ? খুব সোজা, একেবারে যাকে বলে জলের মতন সোজা কাজ। বিয়োগফলটা শোনামাত্র রাশিগুলো মনে-মনে যোগ করে নাও। এবার হিসেব করে দেখো, এর সঙ্গে কমপক্ষে আর কত যোগ করলে ৯-এর গুণিতক (অর্থাৎ ৯ দিয়ে সম্পূর্ণ ভাগ দেওয়া যায় এমন সংখ্যা) পাওয়া যাবে। যে-সংখ্যা পাবে, সেটাই তোমার বন্ধুর পছন্দ-করা সংখ্যা।

বেশ তো, আগের উদাহরণটিই ধরো না কেন। মনে করো, ১৯৬১ থেকে ৬ সংখ্যাটা পছন্দ করে, ১৯১ লিখে, তার থেকে আগের করা যোগফল ১৭ বিয়োগ দিয়ে, সে তোমাকে ১৭৪ (১৯১—১৭) সংখ্যাটা জানাল।

তুমি সঙ্গে-সঙ্গে মনে-মনে পাচ্ছ ১+৭+৪=১২। ১২-র সঙ্গে আর কমপক্ষে কত যোগ দিলে ৯-এর গুণিতক হবে? ৯ একে ৯, ৯ দুগুণে ১৮। ১৮ থেকে ১২ বিয়োগ দিয়ে ৬ সংখ্যাটা পেয়ে গেলে।

এটাই তো বন্ধুর পছন্দ-করা আলাদা-করে-রাখা সংখ্যা!

ম্যাজিক • জাদুকর পি. সি. সরকার জুনিয়র

আশুতোষ কলেজে যখন পড়তাম, তখন আমাদের কেমিস্ট্রির প্রফেসর সিদ্ধান্তবাবুর বাড়িতে প্রায়ই নানা-রকম আসর বসত। লেখাপড়া থেকে শুরু করে গান বাজনা ম্যাজিক সবই হত সেখানে। স্যারের সাথে আমরা সিনেমায় যেতাম, হৈচৈ করতাম, আবার লেখাপড়ায় বসতাম। তার ফলে লেখাপড়া জিনিসটাকে কোনও দিনই ভীতিকর বলে মনে হয়নি। ভালোয় ভালোয় সবাই পাশ করেছি। এখন বুঝতে পারছি, এই সবই স্যারের ম্যাজিক। সিদ্ধান্তবাবু জানেন কীভাবে পড়াশোনা করিয়ে নিতে হয়। চিন্তা করে দেখো, বছরের বেশির ভাগ সময়ই আমি ম্যাজিক নিয়ে ব্যস্ত থাকি, এবং বাইরে-বাইরে থাকি। পরীক্ষার হয়তো দু-এক মাস আগে বাড়ি ফিরতে পারলাম। ঐ দু-এক মাসের মধ্যেই সিদ্ধান্তবাবু আমায় ঠিক তৈরী করে দিতেন। স্যারের কাছে এজন্য আমি চিরদিনের ঋণী।

স্যারের ছেলে আশিস আমাদের কাছে 'বাবু' নামে পরিচিত। সেদিন রাস্তায় হঠাৎ বাবুর সঙ্গে দেখা। ও সেই আগের মতোই আছে, রাস্তার মধ্যেই ধরে বসল, "প্রদীপদা, একটা ম্যাজিক দেখবো।" অন্য কেউ হলে হয়ত আপত্তি করতাম ; কিন্তু বাবুর বেলায় তার উপায় নেই। কারণ ভীষণ নাছোড়বান্দা ছেলে সে। ম্যাজিক না দেখে ছাড়বেই না। বললাম, "ঠিক আছে, কিসের ম্যাজিক বলো?" সে একটু ভেবে পকেট থেকে দুটো বিস্কুট বের করে বললো, "এগুলো দিয়ে।" আমি বেশ চমকে গেলাম। এত তাড়াতাড়ি ও ঠিক করে ফেলবে, ভাবতেই পারিনি। মজা করবার জন্য বললাম, "বিস্কুট তো খেয়ে ফেললেই ভ্যানিশ হয়ে যায়—তা আর কঠিন কী?" বাবু চিৎকার করে উঠলো, "না, না, ওসব বাজে কথা নয়, ম্যাজিক চাই, ম্যাজিক।" স্যারের বাড়িতে যখন যেতাম, তখন বাবু আমায় ম্যাজিক দেখাতে বললে আমি তো এড়িয়ে যাবার চেষ্ট করতাম, তখন ও ঠিক একইরকমভাবে চিৎকার করত, আর তারপর আমার চুল-জামা-কাপড় ধরে টানাটানি করত। বিপদে পড়ে ম্যাজিক দেখাতেই হত। এবার বাবুকে সেরকম চিৎকার করতে দেখে বেশ ভয়ই পেয়ে গেলাম। রাস্তার মধ্যেই যদি চুল-জামা টানতে আরম্ভ করে? না বাবা, দরকার নেই কথা বাড়িয়ে। বললাম, "কী দেখতে চাও বলো।" সে বলল, "এগুলো ভেঙে জোড়া লাগিয়ে দাও।" আমি পড়লাম ফ্যাসাদে। কী ভাবে সেটা করা যায়।

হঠাৎ একটা বুদ্ধি মাথায় এলো। বললাম, বিস্কুট দুটোকে একটা ঠোঙার মধ্যে ভেঙে অর্ধেকটা তোমার আর বাকী অর্ধেকটা আমার কাছে থাকবে। তোমার টুকরোগুলো মুখে পুরে চিবুতে শুরু করবে, অমনি দেখবে আমার টুকরোগুলো জোড়া লেগে আস্ত হয়ে গেছে।"

একটা বড়ো ঠোঙাও জোগাড় হয়ে গেল। আমি একটা বিস্কুট সেই ঠোঙার মধ্যে রেখে আধখানা করে ভাঙলাম। এক টুকরো বাবুকে দিয়ে চিবুতে বললাম, আর অন্য টুকরোটা ঠোঙার ভেতরই রইল। এবার আবার দ্বিতীয় বিস্কুটটাকে ঠোঙার ভেতর নিয়ে ঠিক আগের মতোই ভেঙে এক টুকরো আবার বাবুকে দিলাম। আমার কথামতো বাবু সেগুলো চিবুতে আরম্ভ করল, আর চোখ রইল ঠোঙাটার ওপর, যদি কোনও কারসাজি করি?

ঠোঙাটার মুখটাকে বন্ধ করে দিয়ে আমি ম্যাজিকের মন্ত্র পড়লাম। একটু পরেই ঠোঙাটা খোলা হল। অবাক কান্ড, সেখানে আস্ত একটা বিস্কুট রয়েছে। বাবু তো মুগ্ধ।

বিস্কুটটা কীভাবে জোড়া লেগেছিল, আজ সেটাই আমি তোমাদের শিখিয়ে দেব। ভীষণ সহজ ম্যাজিক এটা। প্রথম বিস্কুটটাকে ঠোঙায় পুরে আমি সত্যি-সত্যিই দু-টুকরো করেছিলাম, এবং তার এক টুকরো বাবুকে খেতে বলেছিলাম। দ্বিতীয় বিস্কুটটাকে যখন ঠোঙায় ঢোকালাম, তখন সেটাকে—না ভেঙে—ভাঙবার অভিনয় করেছিলাম, এবং ঐ দ্বিতীয় বিস্কুটের টুকরো হিসেবে প্রথম বিস্কুটের টুকরোটা তুলে এনে বাবুকে দিয়েছিলাম। ঠোঙার ভেতরে ঐ দ্বিতীয় বিস্কুটটা আস্তই রইল। বাইরে থেকে কেউই সেটা বুঝতে পারবে না। তোমরা একটু অভ্যাস করে বন্ধু-বান্ধবদের দেখিও : তারাও কেমন অবাক হয়ে যাবে।

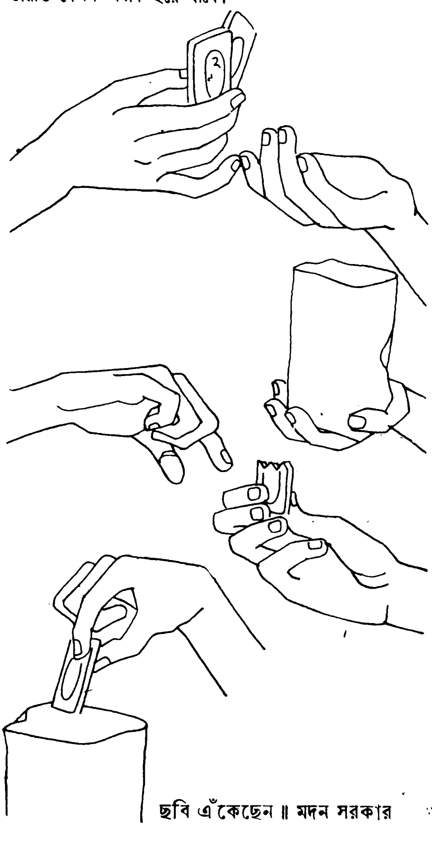

ছবি এঁকেছেন ॥ মদন সরকার

আম্পায়ারিং

মতি নন্দী

জাপানী বোমার ভয়ে, কলকাতা অর্ধেক খালি করে একবার মানুষ উর্ধ্বশ্বাসে গ্রামে ছুটে গিয়েছিল। আমরাও গিয়েছিলাম আটঘরায়। তারকেশ্বর থেকে খুদে রেল বি-পি-আরে চড়ে আটঘরা মাইল সাতেক। রেলগাড়ি উঠে গিয়ে এখন অবশ্য বাস চলছে। যেমন, তখনকার তিনটে চালাঘর নিয়ে হাইস্কুলটা এখন বিরাট তিনতলা পাকা বাড়ি। আমাদের এই বাৎসরিক, আটঘরার সঙ্গে পাশের গ্রাম বকদিঘির, ক্রিকেট ম্যাচের পত্তন সেই সময় থেকেই।

তখন বাংলায় জমিদাররা ছিল। আটঘরায় ছিল সিংহরা, বকদিঘিতে মুখুজ্যেরা। কর্নওয়ালিস যেদিন থেকে জমিদার তৈরির কাজে হাত দেয়, সেই দিন থেকেই নাকি সিংহ আর মুখুজ্যেদের মধ্যে ঝগড়া, খুনোখুনিরও পত্তন। কালক্রমে সেই বিবাদের চেহারা বদল হতে-হতে অবশেষে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ থেকে সেটা বাৎসরিক ক্রিকেট ম্যাচের রূপ নেয়। ডিসেম্বরে বড়দিনের সপ্তাহে ম্যাচটি খেলা হয়। এ পর্যন্ত ফল আটঘরার ১২টি জিত, বকদিঘির ১৩টি। একটিও ড্র হয়নি। খেলাটা হয় হোম-অ্যাওয়ে প্রথায়। একবছর বকদিঘির ফুটবল-মাঠে, পরের বছর আটঘরার রথতলায়।

এত বছর ধরে খেলা হচ্ছে, তাই দুই গ্রামের লোকই ক্রিকেটে বেশ রপ্ত হয়ে গেছে। মেডেন ওভারে হাত তালি দেয়, এমনকী খোঁচা মেরে রান পেলে মুচকে হেসেও ফেলে। বকদিঘির উইকেটকীপার পঞ্চু কলুর বৌ বা আটঘরার দৈত্য-প্রমাণ ফাস্টবোলার চণ্ডী কম্পাউণ্ডারের মা-ও এই খেলা দেখতে মাঠে আসে। যাদের মাঠে খেলা, তারাই লাঞ্চ দিত বিপক্ষকে। কিন্তু বছর ছয়েক আগে বকদিঘির লাঞ্চ খেয়ে আধঘণ্টার মধ্যেই আটঘরার পুরো টিমটা ফিল্ড করার বদলে মাঠ ছেড়ে পাশের ঝোপঝাড়ে-ভরা মাঠে জরুরী কাজে ফিল্ড করতে ঘনঘন ছুটে যাওয়ায়. আটঘরা হেরে যায়। তখন থেকেই 'নিজেদের লাঞ্চ নিজেদের' রীতিটি চালু হয়।

খেলার সাতদিন আগে থেকেই সিংহ আর মুখুজ্যে বংশের লোকেরা গ্রামে আসতে শুরু করে। একজন লোকসভা-সদস্যও সেবার হাজির। ম্যাচের নিয়ম, দুজন আম্পায়ার থাকবে দুপক্ষ থেকে। আটঘরা হাইস্কুলের অঙ্কের মাস্টার বুদ্ধদেববাবু গত তিন বছর আম্পায়ারি করেছেন. এবার তিনি নারাজ। গতবছর তাঁর দেওয়া তিনটি রান আউট, দুটি এল-বি-ডবলু আটঘরার পাঁচ উইকেটে হারায় প্রভূত সাহায্য করে। মাস চারেক তিনি হাট, পোস্ট অফিস, হেলথ সেণ্টার কোথাও যেতে পারেননি। কানাঘুষো শোনা যায়. বকদিঘি স্কুলের সেক্রেটারি বনমালি মুখুজ্যে নাকি অ্যাসিস্ট্যাণ্ট হেডমাস্টার পদে যোগ দেবার জন্য বুদ্ধদেববাবুর কাছে লোক পাঠিয়েছিলেন। কেউ বলে, পঞ্চু কলু নাকি প্রতিমাসে এক কেজি নির্ভেজাল সরষের তেল বুদ্ধু স্যারকে পাঠাচ্ছে।

আমি, পরমেশদা—পরমেশ সিংহ—আর নন্তু দত্ত প্রচুর অনুনয়-বিনয় করেও বুদ্ধদেববাবুকে রাজি করাতে

পারলাম না। তাঁর এক কথা : "আমি ভিলিফায়েড বাই মাই ফ্রেন্ডস অ্যান্ড নেইব্যারস, ইভন বাই মাই পিউপিলস। অনেস্টলি আম্পায়ারি করে দিস প্রাইস দিতে হল! য়্যাঁ, বলে কিনা সরষের তেল দিচ্ছে! আমি কিনা ব্রাইবড!"

নন্তু দত্তই প্রস্তাব দিল, "চলো গোপীনাথবাবুর কাছে। পার্লামেন্টের মেম্বার, তার উপর উনি সিংহ নন, সুতরাং নিরপেক্ষ। ওনার ডিসিশানের উপর কথা বলবে, এত সাহস গোটা হুগলি জেলায় কারুর নেই।"

গোপীনাথ ঘোষের কাছে গিয়ে কথাটা পাড়ামাত্রই তিনি রাজী। আমরা মুখ-চাওয়াচাওয়ি করলাম। এত তাড়াতাড়ি রাজী হবেন ভাবিনি।

"তবে ভাই, ক্রিকেট আইনের বিন্দুবিসর্গও জানি না। জীবনে ক্রিকেটও খেলিনি।" একগাল হেসে এম-পি গোপীনাথ ঘোষ বললেন।

"তাতে কী হয়েছে," পরমেশদা একজন এম-পি আম্পায়ার মাঠে নামানোর কৃতিত্ব থেকে আটঘরাকে বঞ্চিত করতে রাজী নয়। "এখনো চারদিন তো হাতে রয়েছে। অ আ থেকে বিসর্গ চন্দ্রবিন্দু পর্যন্ত আইন আপনার জানা হয়ে যাবে। আমার কাছে উইজডেন আছে। জলের মত সোজা, সংবিধানের ধারা-উপধারার থেকেও সরল ব্যাপার।"

নন্তু দত্ত বলল, "শুধু মুখস্থ করে ফেলুন স্যার। আপনার মত লোক, যাঁর সঙ্গে বাঘা বাঘা মিনিস্টাররা পর্যন্ত আইন-টাইন নিয়ে ডিবেট করতে ভয় পায়, তাঁর কাছে উইজডেন তো—" তুড়ির পটাস শব্দ হল।

আমি বললাম, "আসলে যেটা দরকার, তা হল ব্যক্তিত্ব। ওটা থাকলে কেউ আর টাঁফোঁ করতে সাহস পাবে না। বকদিঘির পতু মুখুজ্যে টেঁটিয়া ক্যাপ্টেন, আম্পায়ারকে ঘাবড়ে দিতে দারুণ ওস্তাদ। আপনার মত ব্যক্তিত্ববান, রাশভারি লোক মাঠে থাকলে—"

"বুকের পাটা স্যার, শুধু এইটুকু। আপনি যা বলবেন সবাই মানতে বাধ্য এই কথাটা আর উইজডেন—এই দুটো মনে রাখা, তাহলেই আম্পায়ার।"

গোপীনাথ ঘোষ শুনতে-শুনতে মাথা নেড়ে গেলেন। আমরা অনেকটা আশ্বস্ত হলাম।

পরদিনই পরমেশদা আর আমি উইজডেন নিয়ে গেলাম। যাবার সময় পরমেশদা আমায় বোঝাল, "রাজনীতি যারা করে-টরে, তাদের নাকের সামনে আইন-কানুন, ধারা-উপধারা এইসব যদি ঘাসের আঁটির মত ধরিস, দেখবি লোভ সামলাতে পারবে না।"

পরমেশদা কথায়-কথায় উইজডেনের পাতা উল্টে গোপীনাথ ঘোষের সামনে এগিয়ে ধরে বলল, "এই ৩৫ নম্বর আইনটা, কী যে অদ্ভুত রকমের। ব্যাটসম্যান কট আউট হবে যদি ফিল্ডসম্যান বলটিকে দেহের সঙ্গে আঁকড়ে ধরে। উইকেটকীপারের প্যাডের মধ্যে বল ঢুকে গেলেও কট আউট হবে—আচ্ছা কাণ্ড! আঁকড়ে ধরা আর ঢুকে যাওয়া দুটো কি এক হল?"

"বটে বটে, ইন্টারেস্টিং তো!"

পরমেশদা আবার ঘাসের আঁটি এগিয়ে ধরল।

"কুড়ি নম্বর আইনের চারের উপধারা—" উইজডেনের পাতা ওল্টাল পরমেশদা, "বলছে, আম্পায়ার বাউন্ডারি নয়।"

"য়্যাঁ তাই নাকি! যদি হতো তাহলে তো আম্পায়ারকে লক্ষ্য করেই সবাই বল পেটাতো। কী সর্বনাশ।

খুব ভেবেচিন্তে আইন করেছে তো। দেখি দেখি বইটা।"

আমরা প্রচুর আশ্বস্ত হয়ে বইটা ওঁর হাতে তুলে দিয়ে চলে এলাম। খেলার আগের কটা দিন আমরা দু'বেলা যেতাম। উনি একগাল হেসে শুধু বলতেন, "দারুণ, দারুণ বই। মুখস্থ হয়ে এল প্রায়।"

খেলার দিন গোপীনাথ ঘোষ উইজডেন হাতে এলেন। মাঠের ধারে চেয়ারে বসে মন দিয়ে পড়তে শুরু করলেন। দেখে একটু দমে গেলাম। এখনো মুখস্থ হয়নি, তার-উপর প্রকাশ্যে এইভাবে পড়তে দেখলে বকদিঘির লোকে-রাই বা কী ভাববে।

"সবরকম ভেবেচিন্তেই দেখছি আইন করেছে। বল আম্পায়ারের গায়ে লাগলে ডেড হবে না, তার পকেটে কি কাপড়চোপড়ের কোথাও আটকে গেলে তবেই হবে। উফ্, কী দূরদৃষ্টি। এবার পার্লামেন্টের লাইব্রেরিতে উইজ-ডেন রাখার জন্য মোশান আনব।"

গোপীনাথ ঘোষকে থামিয়ে নন্তু দত্ত শুধু মনে করিয়ে দিল, "স্যার, ব্যক্তিত্বর কথাটা ভুলে যাবেন না যেন।"

পতু মুখুজ্জের গলা শোনা গেল। "তোদের আম্পা-য়ার কে হবে রে?"

পরমেশদা উদাসীন ভঙ্গিতে বলল, "পার্লামেন্টে কোম্পানি ল সাবকমিটির মেম্বার গোপীনাথ ঘোষ আমাদের আম্পায়ার। তোমাদের?"

পতু মুখুজ্জে কেমন যেন চুপসে গেল। আমতা-আমতা করে বলল, "আমাদের তো বরাবরের মতই হরিশ কর্মকার।"

বকদিঘি ড্রামাটিক সোসাইটির প্রম্পটার হরিশ কর্ম-কার। টসে জিতে বকদিঘি আমাদের ব্যাট করতে দিল। মেপে পা ফেলে গোপীনাথ ঘোষ উইকেটের দিকে এগো-লেন। অবয়ব থেকে রাশভারিত্ব বিচ্ছুরিত হচ্ছে। তাঁর পিছনে হরিশ কর্মকার যেন বাঘের পিছনে ফেউ। বক-দিঘির ফিল্ডাররা এমনই ব্যোমকে গেছে যে, অন্যান্য-বারের মত ক্যাচ লোফালুফি করে মাঠে নামতে পর্যন্ত ভুলে গেল। শুধু তাই নয়, কারণে-অকারণে বকদিঘির বোলার, উইকেটকীপার, বলতে গেলে প্রায় গোটা টিমই চিৎকার করে যেরকমভাবে অ্যাপীল করে থাকে, এবার তার কিছুই হল না। এমন নিঃসাড়ে খেলা হতে লাগল যে, আটঘরার ব্যাটসম্যানরা নার্ভাস হয়ে পড়ল।

বকদিঘির বোলার মুকুন্দ মালখণ্ডি যখন অ্যাপীল করে, আশপাশের গাছ থেকে পাখিরা ভয়ে উড়ে যায়। মুকুন্দ শুধু একবার অ্যাপীল করেছিল অত্যন্ত সম্ভ্রম-ভরে, নম্র এবং এতই মৃদুকণ্ঠে যে গোপীনাথ ঘোষ তা শুনতেই পাননি। সোজা তাকিয়ে রইলেন গম্ভীর মুখে। মুকুন্দই শুধু নয়, হরিশ কর্মকার পর্যন্ত সেই রাশভারি মৌন নাকচে এতই জড়সড় বোধ করল যে, পরের ওভারে আমার উইকেটের সামনে রাখা পায়ে সোজা বল এসে লাগলেও কর্মকার নট আউট বলে দেয়।

আটঘরার ইনিংস ১১২ রানে শেষ হল। বকদিঘির প্রথম উইকেট পড়ল শূন্য রানে। পতু মুখুজ্জে অফ স্টাম্পের বাইরের বল কাস্তে চালাবার মত কাট করতেই খিঁচিং অর্থাৎ স্নিক। উইকেটকীপার ক্যাচ ধরেই অ্যাপীল এবং গোপীনাথ ঘোষ আঙুল তুললেন। এক্ষেত্রে পতু মুখুজ্জে, বলটা প্যাডে বা বুটে বা কাঁধে লেগেছে বলে সচরাচর তর্ক শুরু করে। এবার একটি কথাও না-বলে মাথা নিচু করে উইকেট থেকে চলে গেল।

পরের ওভারে আটঘরার দুটো এল-বি-ডবলু অ্যাপীল গোপীনাথ ঘোষ নাকচ করে দিলেন। মনে-মনে আমরা খুশীই হলাম। আমাদের আম্পায়ারের নিরপেক্ষতা প্রমাণ হয়ে গেল। দ্বিতীয় উইকেট পড়ল ৪০ রানে। তিনটে ক্যাচ জমিতে পড়ল, চণ্ডী কম্পাউণ্ডার এগারোটি ওয়াইড এবং তার বলে ১৪টি বাইরান হওয়া সত্ত্বেও বক-দিঘির স্কোর দাঁড়াল সাত উইকেটে ৮৫। তারপর ১০১—৮। ব্যাট করছে অতুল মুখুজ্জে, ছ ফুট লম্বা সাড়ে ৯৪ কেজি ওজন, আর বিষ্টু মিশির, সাড়ে পাঁচ ফুট লম্বা এবং ওই একই ওজন। শর্টরান নেবার সময় একবার ওদের পদভারে জমি কেঁপে উইকেটের বেল পড়ে গেল।

আটঘরার হার অবধারিত। বকদিঘি থেকে আসা লোকেরা হৈ হৈ শুরু করেছে। অতুল মুখুজ্জে স্টেডি ব্যাট। শুধু সিধে বলগুলো আটকে যাচ্ছে আর বাইরের বল ছেড়ে দিচ্ছে। অন্যদিকে, আলুর আড়তদার মিশিরজী ডাইনে ব্যাট চালিয়ে বাঁয়ে এক রান এবং বাঁয়ে ব্যাট চালিয়ে পিছন থেকে এক রান—এইভাবে বকদিঘিকে ১০৯ রানে নিয়ে গেল।

আর চার রান হলেই জিত। বকদিঘির হাতে দুটো উইকেট।

এমন সময় ঘটল সেই কাণ্ডটা।

পরমেশদার লোপ্পাই বল, পীচের মাঝামাঝি পড়ে বিষ্টু মিশিরের কাছে আর যেন পৌঁছয়ই না। বলটা এত স্লো ছিল। মিশিরজী প্রথমে ঠিক করেছিল, বাঁয়ে ঝাড়ু চালাবে। তারপর বলের গতি দেখে কেমন ভ্যাবচাক খেয়ে বেলচা চালাবার মত ব্যাটটাকে সামনে ছুঁড়ল বা চালাল। বলটা পীচের মাঝ-বরাবর, সোজা আকাশে উঠে গেল।

আটঘরার সবথেকে বাজে কিন্তু সবথেকে উৎসাহী ফিল্ডসম্যান হোমিওপ্যাথ-ডাক্তার ভুবনেশ্বর সিঙ্গি ছিল মিড অফ আর কভার পয়েন্টের মাঝামাঝি। দৌড়ে পীচের উপর গিয়ে, দু হাতের মুঠো জড়ো করে অপেক্ষা করতে লাগল পড়ন্ত বলটি ক্যাচ করার জন্য।

মিশিরজী প্রাণঘাতী চিৎকার করল অতুল মুখুজ্জের উদ্দেশে—"রান্।"

ব্যাটটাকে তলোয়ারের মত সামনে ধরে, মাথা নিচু করে বিষ্টু মিশির আর ব্যাটটাকে গদার মত কাঁধে রেখে অতুল মুখুজ্জে—দু ধারের উইকেটের দিকে দুজনে রওনা হল। দুজনের মোট ওজন ১৯০ কেজির একটু বেশী বা কম।

ভুবন ডাক্তার দেখতে পাচ্ছে, বরং বলা উচিত শুনতে পাচ্ছে—কেননা তখন সে মুখ তুলে বলের দিকে তাকিয়ে—ওরা দুজন আসছে। ডাক্তার একটু নরমপ্রকৃতির। সম্ভবত ওদের রান নেবার পথে বাধা না-হবার জন্যই ভদ্রতাবশত সে পীচ থেকে সরে গেল।

কম্পাউণ্ডার চণ্ডী চিৎকার করে উঠল, "আরে ছাগল, ক্যাচটা যে নষ্ট হবে।"

ডাক্তার এক মুহূর্ত ইতস্তত করেই আবার পীচের উপর দুই স্টিমরোলারের মাঝে এসে দাঁড়াল। বলটা তার হাতে প্রায় পড়ছে বা পড়েছে, তখনই দুদিক থেকে দুজন এসে পড়ল তার উপর। তারপর তিনজনেই মাটিতে। কিন্তু তার মধ্যেই ডাক্তার সিঙ্গি দুই গন্ধমাদনের মাঝের ফাটল থেকে কোনক্রমে মাথাটা বার করে একটা আওয়াজ করল। আওয়াজে অনেকটা এইরকম একটা জিনিসের আভাস পাওয়া গেল—"হাউজ দ্যাট।"

"আউট।" সময় নষ্ট না করে এম-পি গোপীনাথ ঘোষ বললেন।

দুই ব্যাটসম্যান ভূমিশয্যা থেকে উঠে ধুলো ঝাড়তে-ঝাড়তে তাকাল আম্পায়ারের দিকে। ভুবন সিঙ্গি পীচে হামাগুড়ি দিয়ে চশমার ভাঙা কাঁচ সংগ্রহে ব্যস্ত হল।

"আউট!" আবার বললেন গোপীনাথ ঘোষ।

"কেন আউট?" বিল্টু মিশির ব্যাটটা আবার তলোয়ারের মত বাগিয়ে ধরেছে।

"অবস্ট্রাক্টিং দ্য ফিল্ড—আউট। এরপর সবাইকে অবাক করে গোপীনাথ ঘোষ গড়গড়িয়ে মুখস্থ বলে গেলেন ক্রিকেটের ৪০ নম্বর আইনটা। মিশিরজী ইংরিজী বোঝে না। হতভম্ব হয়ে সে অতুল মুখুজ্যের দিকে তাকাল। অতুল মুখুজ্যে ইংরিজীর এম-এ। গম্ভীর হয়ে মিশিরের দিকে তাকিয়ে ঘাড় নাড়ল।

"বেশ। আইনে যদি বলে তাহলে তো আলবাৎ আউট।" তারপর সন্দেহাকুল স্বরে বলল, "কিন্তু কে আউট?"

মাঠ চুপ। সবাই তাকিয়ে গোপীনাথ ঘোষের দিকে। মনে হল, এই সমস্যার কী উত্তর হবে সেটা তাঁর জানা নেই। ক্রিকেট আইনগুলো ঠিকই মুখস্থ করেছেন, কিন্তু এইরকম পরিস্থিতির উদ্ভব হলে আইনে কী বলা আছে সেটা আর মুখস্থ করা নেই। পীচের ঠিক মাঝখানে, দুদিক থেকে দুজন এসে একইসঙ্গে ভুবন সিঙ্গির ঘাড়ে পড়েছে। দুজনের মধ্যে কে অবস্ট্রাকশানের দায়ে অপরাধী?

"আমাদের মধ্যে কে আউট?" অতুল মুখুজ্যে বিস্ময়-সহকারে বলল।

"দুজনেই।" গোপীনাথ ঘোষ তাঁর ব্যক্তিত্ব এবং জোড়া আঙুল তুলে ধরলেন।

আশ্চর্য, দুই ব্যাটসম্যানই আর কথা না বলে গুটি-গুটি মাঠ ছেড়ে চলে গেল। আটঘরা জিতল তিন রানে। বকদিঘির ওরা নিজেদের মধ্যে ফিসফিস গুজগুজ করছিল বটে কিন্তু ভরসা করে প্রতিবাদ জানাতে এগোয়নি। আইনকানুন কারুরই তো জানা নেই!

দিনসাতেক পরই পতু মুখুজ্যে ঝড়ের মত সাইকেল চালিয়ে পরমেশদার বাড়িতে হাজির হয়েছিল। হাতে একটা উইজডেন।

"এম-পি আম্পায়ারকে দিয়ে আটঘরা আমাদের হারিয়েছে। মামলা করবো আমি।" চিৎকার করতে করতে পতু মুখুজ্যে উইজডেন খুলল। "এই দ্যাখ, খুদে অক্ষরে কী লেখা রয়েছে।"

পরমেশদা আড়চোখে লালকালির দাগ দেওয়া শেষের কথাগুলো দেখে, "ইট ইজ দ্য স্ট্রাইকার হু ইজ আউট।"

"একজনই আউট হয়, দুজন নয়, আর তোদের এম-পি—ঠিক আছে সামনের বার আমরাও এম্পিয়ারিং দেখাব।"

ছবি এঁকেছেন ॥ সুধীর মৈত্র

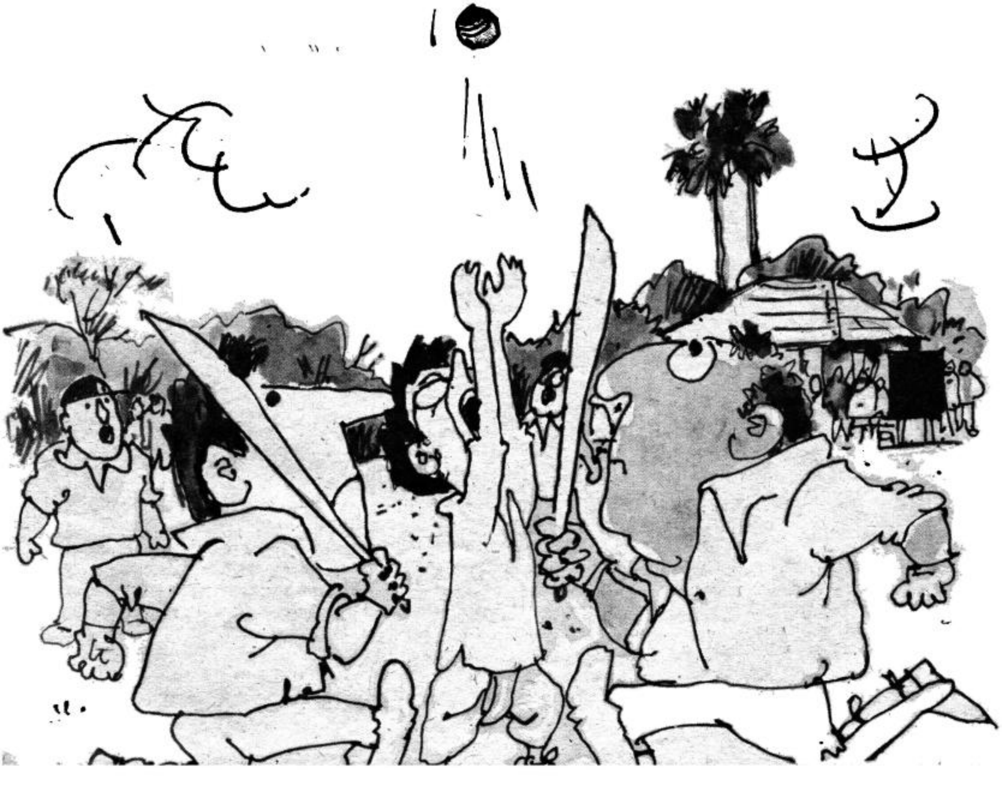

রাজায় রাজায় / কি করে দাবা খেলতে হয়

প্রতিপক্ষের রাজাকে নানাভাবে মাত করা সম্ভব। দু পক্ষের রাজা কেবল বোরডে থাকলে কেউ কাউকে হারাতে পারে না, সেজন্য এই খেলাকে ড্র হয়েছে বলে ধরে নেওয়া হয়। ধরা যাক কালোর কেবল রাজা রয়েছে, এখন সাদা রাজার সঙ্গে যদি মন্ত্রী থাকে, তাহলে কালো রাজাকে মাত করা সম্ভব। সাদা রাজার সঙ্গে কেবল একটা নৌকো থাকলেও কালো রাজাকে মাত করা যায়। কিন্তু কেবল একটা গজ নিয়ে প্রতিপক্ষকে মাত করা যায় না। মাত করতে হলে দুটো গজের প্রয়োজন। এটা কীভাবে করা যায়, বোরডে ঘুঁটি সাজিয়ে দেখে নিতে হবে। একটি গজ এবং একটি ঘোড়া দিয়ে মাত করা যায়, কিন্তু এটা বেশ কঠিন। আর দুটি ঘোড়া দিয়ে মাত করা সম্ভব, কিন্তু তা খুবই কঠিন, যদি প্রতিপক্ষ ভেবে চিন্তে চাল দিতে পারে তাহলে তা অসম্ভব।

যখন প্রতিপক্ষের রাজাকে কিস্তি দেওয়া হয়নি, অথচ রাজার কোন চাল নেই, এবং অন্য কোনো ঘুঁটিও চাল দেওয়া যায় না, তখন বলা হয় চাল-মাত। চালমাত মানে হচ্ছে খেলা ড্র! অনেক সময় খেলায় হেরে যাচ্ছে এমন খেলোয়াড় চালমাতের চেষ্টা করে, যাতে খেলা ড্র হয়ে যায়!

খেলা সম্পর্কে কতকগুলি নিয়ম মেনে চলা ভাল ঃ

১) একবার কোন ঘুঁটি চাল দিলে তা ফেরত নেওয়া যায় না।

২) নিজের কোনো ঘুঁটি যদি কেউ ছুঁয়ে ফেলে, তাহলে সেই ছোঁওয়া ঘুঁটিটিকেই চালতে হবে। যদি সেটা চালা সম্ভব না হয়, অর্থাৎ আইনসঙ্গতভাবে চালা না যায়, তাহলে অবশ্য অন্য কোন চাল দেওয়া যেতে পারে।

প্রতিযোগিতার খেলায় অবশ্য খুব কঠোর নিয়ম আছে। চাল দেবার জন্য নির্দিষ্ট সময় ঠিক করে দেওয়া থাকে, চাল দিতে দেরি হলে হার হয়েছে স্বীকার করতে হবে। খেলা শুরু হওয়ার যে নির্দিষ্ট সময়, তার এক ঘণ্টার মধ্যে যদি একজন খেলোয়াড় না এসে পৌঁছয়, তাহলে উপস্থিত খেলোয়াড়কে বিজয়ী বলে ধরে নেওয়া হয়। কিন্তু সে-সব নিয়ম প্রয়োজন হলে প্রতিযোগিতার যাঁরা ব্যবস্থা করেন, তাঁদের কাছ থেকে জেনে নিতে হবে।

দিগ্‌দর্শক

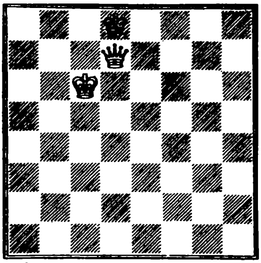
মন্ত্রীর সাহায্যে মাত।

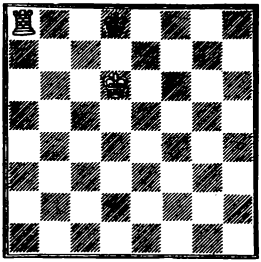
একটি নৌকোর সাহায্যে মাত।

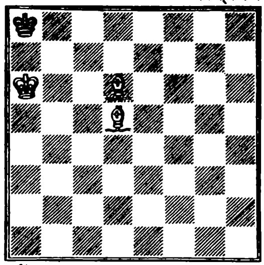
দুটি গজের সাহায্যে মাত।

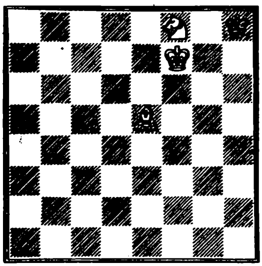
ঘোড়া এবং গজের সাহায্যে মাত।

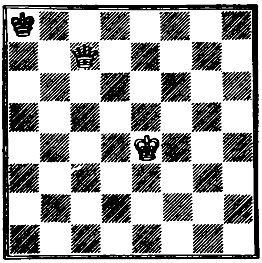
চাল মাত ঃ এখানে দেখানো হয়েছে মন্ত্রী যেখানে রয়েছে সেখানে থাকার ফলে কালো রাজা কোথাও যেতে পারছে না। এই অবস্থায় যদি এখন কালোর চাল হয়, তাহলে খেলা ড্র হয়েছে ধরে নিতে হবে। নানা অবস্থায় চাল মাত হতে পারে।

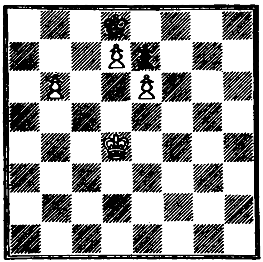
চাল মাত ঃ কালো রাজার কোন চাল নেই।

ক্লডিয়াস পরিবারের কাহিনী

স্ট্রাইকার

ভারতীয় হকি টিম এ-পর্যন্ত অলিম্পিকের সোনা জিতেছে সাতবার। সাতবারের মধ্যে সর্বাধিক চারবার খেলেছেন মাত্র দুজন। বাংলার লেসলি ওয়াল্টার ক্লডিয়াস এবং উধম সিং। ক্লডিয়াস অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান, উধম সিং পানজাবী শিখ। তিনটি সোনা ও একটি রুপোর মেডেল দুজনেরই আছে। দুজনেই ডাকসাইটে হকি-অলিম্পিয়ান। লেসলি ক্লডিয়াস হাফ লাইনের দুর্ভেদ্য খেলোয়াড় আর উধম ফরোয়ার্ড লাইনে অব্যর্থ রকেট। উধম এখনও খেলায় আছেন, লেসলি এখন আর খেলেন না। হকি খেলার ধারাটি ক্লডিয়াস পরিবারে কোন বাধা পায়নি। তার বড় ও সেজ ছেলে যথাক্রমে হেনরি ও রবার্ট ভবিষ্যৎ ভারতীয় টিমে বাপের সুনাম রাখবেন। হকি খেলাকে এরকম দিনের-পর-দিন পারিবারিক জীবনে জড়িয়ে এগিয়ে চলার দৃষ্টান্ত খুব বেশী নেই। ধ্যানচাঁদরা এই ধরনের গৌরবে গৌরবান্বিত। ত্রিশের দশকের ধ্যানচাঁদ, রূপসিংয়ের পারিবারিক গৌরব বর্তমানে ধরা পড়ে রাজকুমার ও অশোককুমারের খেলায়।

ক্লডিয়াস-পরিবারে হকির সাধনাটা এসেছে রূপকথার ধাঁচে। সেই রূপকথার কথা পাড়ার আগে আরও একটু উধমকে নিয়ে বরং গল্পের ভ্রিবলিংটা চালাই। লেসলি ও উধম দুজনের সঙ্গেই আমার আলাপ হয়েছে। কাছাকাছি থেকে জেনেছি, দুজনেই মাটির মানুষ। উধমের চেহারায় এখনও কোন ভাঙচুর নেই। যেন ইস্পাতের ফলা। লেসলির চেয়ে উনি এক বছরের ছোট। সাতচল্লিশ চলেছে। লেসলির মাখন-মাখন চেহারায় চামড়ার রঙটা জায়গায় জায়গায় সেঁকা পাঁউরুটির মত। এখন চশমা পরেন। দিলটা তাঁর ময়দানের মতই বিরাট। সেদিন ওঁর সঙ্গে কথা হচ্ছিল দুই ছেলে হেনরি ও রবার্টের খেলা নিয়ে। উধমের কথাও উঠল। বললেন: "আহা, উধমের বরাতটাই মন্দ। তার যে আটচল্লিশ সালে লণ্ডনেই প্রথম অলিম্পিক খেলার কথা। ঠিক যাওয়ার আগে মনোনীত হয়েও বাদ পড়ে, হাতে চোট পাওয়ার জন্য। অক্লেশে ও আমার চারবার অলিম্পিক খেলার রেকর্ডের সঙ্গী থাকতে নাও পারত। উধম সত্যিই এক অদ্ভুত প্লেয়ার। কী করে যে সে এখনো প্রথম শ্রেণীর খেলা খেলছে বুঝতে পারি না।" বুঝতে পারলাম, গুণীকে সম্মান দিতে ক্লডিয়াসের কুণ্ঠা নেই।

এই নির্লিপ্ত ক্লডিয়াসকে ঘরোয়া অবস্থায় প্রথম দেখি সাত বছর আগে। এখনও তিনি সেই কলকাতার সাহেব-পাড়ায় ম্যাকলিয়ড স্ট্রিটের ফ্ল্যাটেই রয়েছেন। সেই প্রথম সাক্ষাৎকারের সময়ের কথা মনে পড়ে। মেক্সিকো অলিম্পিকের মশালে তখনো আঁচ পড়েনি। ক্লডিয়াসের কথা আমাদের মন থেকে তখন প্রায় উবে যাওয়ার দাখিল।

কী তাঁর অপরাধ? এত বড় হকি প্লেয়ার হঠাৎ কেন মন্দ হয়ে গেলেন? আসলে চ্যাম্পিয়ন প্লেয়ারকে সবাই চ্যাম্পিয়ন হিসাবেই দেখতে চায়। ওই উঁচু থেকে একটু টলে পড়লেই তাঁর খ্যাতিতে মরচে ধরে। এমন কী তাঁর অনুরক্ত ভক্তও তখন মুখ ফিরিয়ে নেয়।

তবে খুলেই বলি, ক্লডিয়াস কেমনভাবে আলোয় থাকতে-থাকতে কালোয় চলে গেলেন। উনিশশো আটচল্লিশের লনডন অলিম্পিকে ক্লডিয়াস প্রথম খেলেন। সেই অলিম্পিকে ক্লডিয়াস একটা মাত্র ম্যাচ খেলেছেন। পরের দুটো (হেলসিঙ্কি ও মেলবোর্ন) অলিম্পিকে ওঁকে ছাড়া টিম মাঠে নামাবার কথা ভাবা যেত না। পরের কবছর ক্লডিয়াসের খেলার মান চড় চড় করে চরমে পেঁছিয়। সেটা ছিল লনডনে ১৯৫৯-এর আন্তর্জাতিক হকি টুর্নামেণ্ট। ক্লডিয়াসকে প্রায় সব দর্শকেরই মনে ধরেছে। লনডন টাইমসে লেখা হয়েছিল, "হকি খেলাকে লাঠালাঠি ছাড়া অন্য কিছু হিসাবে যারা ভাবতে রাজি নয়, তাদের ভালভাবে ক্লডিয়াসের খেলা দেখা উচিত। ক্লডিয়াস শিল্পীর মেজাজে হকি খেলেন। হকি-খেলার ইতিহাসে এমন প্লেয়ার দুটি মেলা ভার।"

পরের বছরই ক্লডিয়াস রোম (১৯৬০) অলিম্পিকে ভারতের অধিনায়ক নির্বাচিত হন। দুর্ভাগ্য, ভারত রোম অলিম্পিকে পাকিস্তানের কাছে ০—১ গোলে হার মানে। টিম হারলেও ক্লডিয়াসের চেষ্টায় কোন ত্রুটি ছিল না। কিন্তু লোকে সে-কথা বুঝল কই? রব উঠল "হেরো ক্যাপ্টেন ক্লডিয়াস, হেরো ক্যাপ্টেন।" রোমের ঘটনার আট বছর পরে সেই সাক্ষাৎকারের এক সময় দেখলাম—সত্যিই ক্লডিয়াসের চোখ ছলছল করছে। মনের জোর চুরমার হয়ে গেছে। এমন কী, ঠিক করে ফেলেছিলেন, অস্ট্রেলিয়ায় চলে যাবেন। তাঁর স্ত্রী ভিলিয়ারও নাকি তাই মত।

ক্লডিয়াসের ফ্ল্যাটে পা দেওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই তাঁর আলমারির দিকে তাকিয়ে ঠিক করে ফেলি, ওই অলিভ-পাতার মালায় গাঁথা অলিম্পিক গোল্ড মেডেলের একটিকে আমি হাতে নেবই। ফুরসত হলে কথা পাড়ব, "সাহেব, ওটা আমি বাড়ি নিয়ে গিয়ে আর-পাঁচজনকে দেখাতে পারি কি?" অথচ ক্লডিয়াস সেই প্রথম আমাকে খুব কাছাকাছি দেখলেন। তাও তো কয়েক ঘণ্টার দেখা, এবং কিছু আলোচনা। অজান্তে আমার অনুরোধটি ঠোঁট থেকে খসে পড়তেই দেখি, ক্লডিয়াস কোন চিন্তা না করেই এককথায় রাজী। দিন দুয়েক কলকাতা থেকে বর্ধমান—নানাজনকে অলিম্পিক সোনার মেডেলটি দেখালাম। চোখ ছানাবড়া করে পরিচিতরা দেখল। মেডেলের গায়ে হাত বুললো। এবং ওজনও নিল। কথামত ঠিক সময়ে ঠিক দিনে ক্লডিয়াসের বাড়িতে মেডেলটি ফেরত দিতে পারিনি। ফেরত দিতে গিয়ে আরও অবাক হলাম। একবারও শুনলাম না যে, তিনি এই মেডেলটি ঠিক সময়ে না-পাওয়ার জন্যে আদৌ চিন্তিত হয়েছেন।

মাঝে ক্লডিয়াসকে নানাভাবে দেখেছি। মাসখানেক আগে ক্লডিয়াস-পরিবারের হকি-সাধনা নিয়ে কিছু জানতে আবার তাঁর দরজায় গিয়ে টোকা দিলাম। ইতিমধ্যে ১৯৭১-এ পদ্মশ্রী খেতাব পেয়েছেন। মনে পড়ে এইরকম কিছু-একটা না-পাওয়া নিয়ে তাঁর স্ত্রী ইতিপূর্বে ক্ষোভ জানিয়েছিলেন। ক্লডিয়াস কিন্তু রা কাড়েননি।

ব্র্যান্ডেনকে পড়াতে-পড়াতে পেঁয়াজ কাটছেন লেসলি...

কে বলে মেমসাহেবরা কুটো ভেঙে দুটো করেন না। মেঝের এক জায়গায় একটু জল পড়েছে। দেখলাম আধা-রুপোলী চুল মাথায় ক্লডিয়াসের স্ত্রী ভিলিয়া পায়ে করে এক টুকরো কাপড়ে জলটা মুছছিলেন। যতক্ষণ রইলাম, একমনে খুটখাট নানা গেরস্থালির কাজ করছিলেন। মাঝে একবার বকুনি দিলেন ছোট ছেলে ব্র্যান্ডেনকে। ব্র্যান্ডেন ঘুড়ির আবদার ধরে সকাল থেকে পড়াশুনো ছেড়েছুড়ে টো-টো কোম্পানি জুড়েছে। কিছুক্ষণ ধরে ব্র্যান্ডেন আর তার মায়ের মধ্যে লুকোচুরি খেলা চলেছে। মটাস করে একটা শব্দ হল। বুঝলাম, ব্র্যান্ডেনের পিঠে লাটাইয়ের ঘা পড়ল।

চার ছেলের সামনে ছড়িয়ে দিয়েছেন হকিতে পাওয়া মেডেলের মণিমুক্তো। (বাঁ দিক থেকে) বোজো, ডিকি, ব্র্যান্ডেন ও ববি।

আজ হয়ত ব্র্যান্ডেনের মা ঘরকন্না নিয়েই ব্যস্ত। সারাদিন কাজ নিয়েই মশগুল। একদিন উনিও খেলা নিয়ে মত্ত ছিলেন। কলকাতার মেয়ে-হকি-মহলে বছর পঁচিশ আগে তাঁকে এক ডাকে সবাই চিনত। শুধু হকি নয় বাস্কেট বল কোর্টেও তাঁর যাতায়াত মন্দ ছিল না। তিনি খেলতেন ওয়ান্ডারার্স ক্লাবে। এখন ছেলেদের খেলাই তাঁর ধ্যানজ্ঞান। ক্লডিয়াসের চারটি অলিম্পিক-মেডেলের মতই চারটি ছেলে। শ্রীমতী ভিলিয়া এখন ওদের খেলার খবর নিয়েই মনের মধ্যে বাঘবন্দী খেলেন।

রান্নাতেও লেসলি কম যান না...

নিঃসন্দেহে ক্লডিয়াস বাঘা খেলোয়াড়। তাঁর বড় ছেলে হেনরি চোখ ফুটে ইস্তক বাপের বিক্রম দেখতে অভ্যস্ত। মনের মধ্যে বড় হওয়ার বাসনা। তার বয়স এখন কুড়ি চলেছে। বাবা তাকে হাতে ধরে কিছুই শেখাতে পারেননি। কী করেই বা পারবেন। হেনরি ছেলেবেলা থেকে আসানসোলে সেন্ট ভিনসেন্ট স্কুলের আওতায় মানুষ। সেন্ট ভিনসেন্টে হকি খেলার পরিবেশটা রীতিমত জমজমাট। মাত্র দু মরশুম খেলেই হেনরি কলকাতা ময়দানে বেস্ট হকি প্লেয়ার মনোনীত হয়েছে। এরই মধ্যে সে বাংলা টিমে অধিনায়ক হওয়ার যোগ্যতা দেখিয়েছে। চাকরি করে ক্যালকাটা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশনে। কলকাতা মাঠে তাকে তার অফিসের হয়েই খেলতে দেখা যায়। ভবিষ্যতের ভারতীয় হকি টিম নিয়ে আলোচনায় সেন্টার হাফ পজিশনে হেনরির যোগ্যতা ইতিমধ্যেই আলোচনার খোরাক।

ক্লডিয়াস তাঁর বড় ছেলের খেলা তেমন খুঁটিয়ে দেখতে পারেননি। হেনরি ভাল খেলুক, এটা ক্লডিয়াস চান। কিন্তু তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র সম্বন্ধে এখনই কোনও বড় সার্টিফিকেট দিতে উনি নারাজ।

জিজ্ঞেস করলাম, "কেমন খেলছে হেনরি?" ক্লডিয়াসের সেই একরকম উদাসীন ভাব। মাথা চুলকোতে-চুলকোতে জবাব দিলেন, "আমি তো ওকে তেমন দেখতে পারিনি। ওর এখনো অনেক-কিছু শেখার আছে। সেন্টার হাফের খেলা প্রচণ্ড দায়িত্বের কাজ। মাঝে-মাঝে বোজো (ডাকনাম) তার পজিশন ঠিক রাখার ব্যাপারটা গুলিয়ে ফেলে। ফরোয়ার্ডকে সাহায্য করতে-করতে এগনোর সময় সঙ্গে-সঙ্গে পিছিয়ে আসার কাজটায় মাঝে-মধ্যে ভুল করে। ভাবছি এবারে আমি ওকে নিয়ে কিছুদিন নাড়াচাড়া করব।"

বোজোর সেজ ভাই ববি অর্থাৎ রবার্টও আসান-সোলের একই স্কুলের ছাত্র। সেও ওখানেই বড় হয়েছে। ওর ব্যাপারটা রীতিমত আকস্মিক। বয়স মাত্র সতের। এরই মধ্যে হকি স্টিক বগলে ভারতীয় স্কুল টিমের হয়ে

জার্মানি, স্পেন ও ফ্রান্সের মাঠে একুশটি ম্যাচে খেলে এল। মাথায় সাড়ে পাঁচ ফুট। দেখতে ফুটবলের স্ট্রাইকারের মত গাঁট্টাগোট্টা। সবে দাড়ি গজাচ্ছে। সব খেলাতেই চৌখশ। হকিতে খেলে হয় সেণ্টার-হাফ, নয় লেফট-হাফ। ওর বাবা ওই বয়সে ইস্টবেঙ্গল ফুটবল টিমে লেফট উইং খেলার জন্য ডাক পেয়েছিলেন। বাবার কাছে শুধু শিখেছে স্টিক ধরা ও বল থামানোর কিছু খুচরো কৌশল।

রবার্ট সম্পর্কে মজার ব্যাপার এই যে, ময়দানে সে এ-পর্যন্ত হকি খেলেনি। কিন্তু সেন্ট ভিনসেণ্টে খেলার গুণে বাংলা জুনিয়ার টিমের হয়ে গত মে মাসে পুনায় খেলে এসেছে। টপাটপ তার উন্নতির রাস্তা খুলে যায়। পুনায় চটকদার খেলা দেখিয়ে ডাক পেয়েছিল বাঙ্গালোরের অনুশীলন ক্যাম্পে যোগ দেওয়ার জন্যে। এরপরই ভারতীয় স্কুল টিমে নির্বাচিত হয়ে তার ইউরোপ সফর।

ইউরোপের মাঠে খেলোয়াড়দের খেলা দেখে রবার্টের মন ভরেনি। বাপের সামনে সেসব কথা বলার সময় ও কেমন যেন ভয়ে সিঁটিয়ে যাচ্ছিল। ববির সম্বন্ধে ক্লডিয়াসের মতামত, ববি খুবই বুদ্ধিমান। তবে তার দাদার দোষটা সেও পেয়েছে। একবার ফরোয়ার্ডদের বল এগিয়ে দিতে উপর দিকে উঠলে নেমে আসার কথা খেয়াল করে না। এই বদভ্যাস তাকে কাটাতেই হবে।

জিজ্ঞেস করলাম, "নানাদিকে শুনি আপনি নাকি এখানকার ডেরা গুটিয়ে অস্ট্রেলিয়ায় চলে যাবেন?"

মুচকি হেসে ক্লডিয়াস বললেন, "ওসব নেহাতই গুজব। কী দুঃখে ভিন্ দেশে যাব? ছেলেরা বড় হয়েছে, ওরা আমার সুনাম রাখতে পারবে। এর পরে অস্ট্রেলিয়ায় গিয়ে এতসব সম্মান নিশ্চয়ই পেতে পারি না। ওখানে যাওয়া মানেই আহাম্মকি।"

ক্লডিয়াস-পরিবারের হকি চর্চার গল্পের ঝাঁপি এখানি কুলুঙ্গিতে তুলে রাখতে পারতাম। একটা কথা কিন্তু মনের মধ্যে টোকা মারবেই। লেসলি এখন তাঁর নিজস্ব কীর্তি এবং দুই ছেলের বিরাট সম্ভাবনার অভিভাবক। এজন্যে গর্বের লেশমাত্র নেই তাঁর চালচলনে। নিজেকে জাহির করার কথা আদৌ তাঁর মনে আসে না। আসলে রূপকথার মত তার খেলোয়াড়ী জীবন বাড়তে বাড়তে এখন পর্বতের সামিল হয়ে উঠেছে। যার টুকরো টুকরো ঘটনা থেকে শিল কুড়িয়ে মোয়া বাঁধা যায়।

মধ্যপ্রদেশের বিলাসপুরেই ক্লডিয়াসের দুষ্টুমিভরা ছেলেবেলার দুপুরগুলো কেটেছে। তাঁর প্রথম দিকে লক্ষ্য ছিল—আমি ফুটবলার হব। ফুটবল খেলার জন্য স্কুল থেকে সটকান্ দিয়েছেন বহুবার। ১৯৪৫ আই এফ শীল্ডের খেলায় বি এন আর টিমের লেফট আউটই পরের বছর বেটনকাপে ওই টিমেই সেণ্টার হাফে খেলেছেন। মাত্র তের দিনের তফাতে এক ফুটবলার হঠাৎ হকি প্লেয়ার হয়ে গেলেন। এই হচ্ছেন ক্লডিয়াস।

ভাই-বোন মিলিয়ে লেসলিরা ছিলেন নজন। ওরা চারভাই—হুবার্ট, লেসলি, এরল ও রিচার্ড। বড়দার ডাক নাম সানু। নিজেকে সকলে ডাকে ইয়ঙ্কা নামে। এরল এরলই। রিচার্ড ছিল ডিকি। কলকাতার ময়দানে রেনজার্সের ফুটবল ও হকি মরসুমে এরল আর ডিকিকে সকলেরই হয়ত মনে থাকার কথা। বিলাসপুর টিমে বড়দা হুবার্ট যখন খেলতেন তখন লেসলিকে অগত্যা মাঠের বাইরে জামাকাপড়, ব্যাগ, ঘড়ির জিম্মাদারের কাজই সারতে হয়েছে। হুবার্ট একই রাইট-হাফ পজিশনে তাঁর চেয়েও ভাল খেলোয়াড় ছিলেন। সেই বিলাসপুর থেকে তিনি খড়গপুর চলে গেলেন, লেসলিরও বরাত খুলে গেল। শুধু হকি ফুটবলই নয়, লেসলি বাংলার কেশব দত্ত, মনোজ গুহ, সুনীল বোসের মত ব্যাডমিণ্টন প্লেয়ারদের সঙ্গে দাপটে খেলেছেন। শুধু লেসলি নয়, বোন আইরিশও ব্যাডমিন্টন কোর্টে খ্যাতনাম্নী।

ক্রমান্বয়ে চারটি অলিম্পিক এবং শতাধিক আন্ত-র্জাতিক হকি ম্যাচে লেসলি খেললেন কীভাবে? এর জন্য প্রচুর খেটেছেন। স্টিক নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বলকে বশে রাখার নানা খুঁটিনাটি কৌশল আয়ত্ত করেছেন। ভাল খেলোয়াড়ের খেলা মনের ডায়েরিতে তুলে রাখতে কখনও ভোলেননি। পরে বাড়িতে তা নিয়ে ছক কেটে উপায়-কৌশল বুঝে নিয়েছেন।

ক্লডিয়াসদের পাঁচ দশক ধরে হকি-মাঠে পারিবারিক ঐতিহ্য বজায়ের ছকটা কীরকম? লেসলি বললেন, "এটা রক্তের টানে হয়ে যায়।" প্রসঙ্গটা অন্য ভাবেও ভাবা যায়, ক্লডিয়াস-পরিবারে মগজের সঙ্গে স্টিকের সম্পর্কে কোনওদিনই কোনও গরমিল নেই।

খেলার বৈশিষ্ট্য দেখিয়ে লেসলি মাঠে নিজের পরিচয় দিতেন। কলকাতা ময়দানে বি এন আর, পোর্ট কমিশনার্স এবং কাস্টমসের জার্সি গায়ে লেসলিকে কখনও অন্যায় আচরণ করতে দেখা যায়নি। মাঠের বাইরেও ছোট-বড় সবাইকে সমানভাবে আদর করেছেন।

পারিবারিক ময়দানে লেসলি এখনও যেন বটগাছ। সকলের প্রতি সমান দরদ। খাই দাই গান গাই, এই সুরেই তাঁর এখনকার জীবনটি বাঁধা। সপ্তাহের কাজের দিন-গুলিতে তাঁকে ব্যস্ত থাকতে হয় ইন্সপেক্টর অব কাস্টমসের চাকরিতে। রবিবারেও ভীষণ ব্যস্ত—বাজার, রান্না আর পপ সঙস নিয়ে। তাঁর দুটি দুঃখ—হকি খেলার সেরা দেশ হওয়া সত্ত্বেও এদেশে এখনও হকি খেলা তেমন কদর পাচ্ছে না। একটা মেয়ে থাকলে বেশ হত। ছেলেদের এই হইচইয়ের মধ্যে এই বয়সে একটু শান্তি পাওয়া যেত।

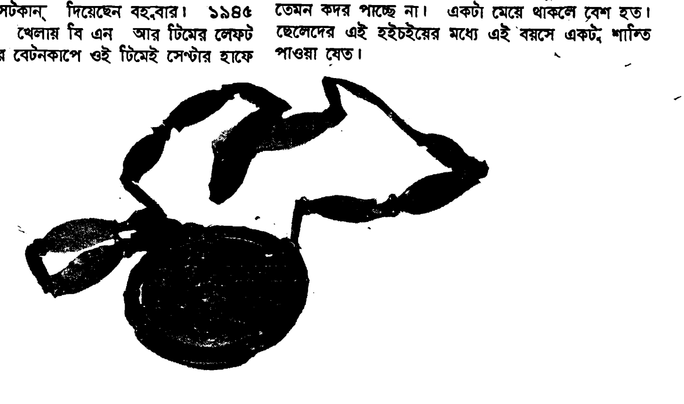

মিনি-ভলিবলে বাংলার খুকীরাই সেরা

রীতিমত হইহই কান্ড রইরই ব্যাপার। দারুণ রমরমা। হায়দরাবাদের ফতে ময়দানে বাংলার ভলিবল খুকী-খোকারা কেল্লা ফতে করে ফিরেছে। দু-মাস আগের ঘটনা। ফতে ময়দানের শাস্ত্রীজী স্টেডিয়াম সারা ভারতের মিনি-ভলিবলারদের জমায়েতে জমজমাট। সবাই পরীক্ষা দিতে নেমেছিল; এই এতটুকু বয়সেও কোন্ রাজ্যের ছেলে-মেয়ে ভলিবলে কতটা এগোতে পেরেছে তার প্রমাণ সেখানে পাওয়া গেল।

ভারতে এই সর্বপ্রথম মিনি-ভলিবল প্রতিযোগিতার আয়োজন। যোগ দিয়েছিল ১৩টি বালক-দল ও আটটি মেয়েদের টিম। বয়সে সকলেই একেবারে মিনিটি—চোদ্দ বছরের নীচে। প্রত্যেকেই সবে মাত্র আঙুলের ডগায় ভলিবল নেওয়ার ফন্দিটা রপ্ত করেছে। তা হলে কী হয়, টিমে টিমে যেন টাগ-অব-ওয়ার রেষারেষি। সকলেই নাছোড়। এরই মধ্যে বাংলার মেয়ে মিনি-ভলিবলাররা চ্যাম্পিয়ন, আর ছেলেরা তৃতীয়।

আসলে শহরে ফুটবল আর ক্রিকেট নিয়ে যত লম্ফঝম্ফ। গ্রামে কিন্তু হু হু করে জনপ্রিয়তা পাচ্ছে ভলিবল খেলা। বিশেষত ছেলেদেরই যত ভিড় ভলিবল কোর্টে। সব বয়সের সব সময়ের সব মানুষের খেলা ভলিবল। হালে মেয়েরাও এই খেলায় নেমেছে। মাত্র বছর সাতেকের চেষ্টা, তবু তারা উন্নতি করেছে হু হু করে। এখন তাদের নামডাক ভারত-জোড়া। ছেলেরা ভলিবল খেলছে সেই কবে থেকে। কিন্তু ভারত-জোড়া সম্মান লাভে তারা মেয়েদের চেয়ে পিছনে। বালকদের তৃতীয় হওয়া এমন কিছু দামী খবর নয়। চ্যাম্পিয়নের সম্মান থেকে ওরা এখনও মেয়েদের চেয়ে দুই-ধাপ পিছনে। আশা করি, ওরা এই সত্যি কথার ধাক্কায় রেগে গিয়ে দারুণ চেষ্টায় চ্যাম্পিয়ন হতে কোমর বাঁধবে। পিঠোপিঠি এখুনি মিনি মেয়ে ভলিবলাররা টেবিল চাপড়ে চেঁচাতে পারে, 'আমরা আজই বলে রাখছি, বড় হয়ে আমাদের ভলিবলার-দিদিদের মত আমরাও চ্যাম্পিয়ন হতে পারব।'

হায়দরাবাদের পথে হাওড়া থেকে ট্রেন ছাড়ার সময় মিনি মেয়েরা একটু মুষড়ে পড়েছিল। শ্রাবণী, রেশমী, সুপ্রা সামান্য ফুঁপিয়েছিল। ওদের মধ্যে একা-একা লাগছিল যোগমায়ার। যাওয়ার কিছুদিন আগেই সে তার মাকে হারায়। নানা বাচ্চা-মেয়েদের ঝাঁকে ভাল-মন্দ নানা ঘটনা ঘটে, সেটাই স্বাভাবিক। ম্যানেজার রুক্মু ঘোষ সেদিকে আগ বাড়িয়ে ঠিক ভেবেচিন্তে সব গুছিয়ে উঠেছেন। পেটের ব্যাটারি যাতে চট করে না ফুরোয়, তার সব বন্দোবস্ত পাকা। অর্থাৎ খাবার-দাবারের আয়োজনে তিনি কোনও ত্রুটি রাখেননি। সেইসঙ্গে দাবা, চাইনিজ চেকার ইত্যাদিরও ব্যবস্থা ছিল। ও'র আবার তুক আছে। একটি 'অপয়া' জিনিস উনি সঙ্গে নেননি। ডিমসিদ্ধ নিতে তাঁর দারুণ আপত্তি। নেনওনি।

হায়দরাবাদে পেঁছেই কাঠের মেঝের কোর্ট দেখে বাংলার মিনি মেয়েদের পিলে-চমকানো অবস্থা। তারা মাটি অথবা ময়দানের সুরকি-কোর্টে খেলতে অভ্যস্ত। ভয় কাটাতেই হবে। কোচ শিবশঙ্কর চট্টোপাধ্যায় ওদের ভয়টা আঁচ করেছেন। নিজেই দুমদাম ওই কোর্টে গড়াগড়ি দিয়ে দেখিয়েছেন, আরে ভয় কী, এ-কোর্ট দেখে ভয় পাওয়ার কিছু নেই। পলকে ওদের ভুল ধারণা পাল্টে গেছে। পটাপট ডিগবাজি মেরে শ্রাবণী নিয়োগী সকলের ভয় ভেঙে দেয়।

প্রথম গ্রুপ-ম্যাচে বাংলা আগুয়ান। তোপের মুখে দিল্লির মেয়েরা যেন তিষ্ঠোতেই পারল না। তারা বাংলার কাছে দুটি গেম খেল মাত্র চার আর এক পয়েন্ট করে। বাংলার ক্যাপটেন তাপসী চৌধুরী আর ঝুনু সাহা অনর্গল ওদের চাপ মেরে মেরে চুপ করিয়ে রেখেছে। একই দিনে সন্ধ্যায় মহারাষ্ট্রও অর্ধেক-রাস্তা পর্যন্ত গিয়েই ধপাস, তারাও স্ট্রেট সেটে হেরেছে। সব মিলিয়ে মেরেকেটে তারা দুটি গেমে যোগাড় করেছে আট আর সাত পয়েন্ট। পরের দিন সকালে মণিপুর টিম প্রথম গেমে ১৩ পর্যন্ত পেঁছেছিল। বাংলার মেয়েদের মনের অবস্থা তখন বেশ থমথমে। দ্বিতীয় গেমে তারা বোধহয় কামাল করবে। কোথায়? ওদেরও একই হাল। পাঁচ পয়েন্ট অবধি এগিয়ে তারপর নট নড়নচড়ন। বাংলার খুকীরা হাসতে হাসতে গ্রুপের খেলা সাঙ্গ করে।

একই দিন সন্ধ্যাবেলায় সেমিফাইনাল পড়ল পানজাবের সঙ্গে। সকলেরই ধারণা, পানজাবের ওইসব লড়াকু চেহারার মেয়েদের সঙ্গে বাংলার ফিনফিনে গড়নের মেয়েরা এঁটে উঠতে পারবে না। ফল কিন্তু উল্টো। প্রথম গেমে পানজাবের যত হাঁক-ডাক মাত্র সাত পয়েন্ট পর্যন্ত গিয়েই ঝিমিয়ে পড়ে। বাংলার মেয়েরা তখন গেম-আপ করেছে। কিন্তু দ্বিতীয় গেম সেয়ানে-সেয়ানে ঠোকাঠুকি। প্রতিটি পয়েন্টের জন্য জমজমাট লড়াই। খেলাটায় দু

পক্ষই শেষের দিকে দারুণ ধুকপুকুনিতে ভুগেছে। দাঁত কষে লড়াই। গেম ১৭-১৭ পয়েণ্টে দাঁড়ায়। তখন ভটাভট দুখানি বোমা সার্ভিস বাংলার কোর্ট থেকে পানজাবের কোর্টে গোঁত্তা মেরেছে। পানজাবী খুকীরা হকচকিয়ে গেছে। বাংলার মেয়েরা তখন গেম আপ করে ম্যাচ মুঠোয় পেয়েছে।

বিশে সেপ্টেম্বরের সকালে বাংলার ছেলেদের সঙ্গে সেমি-ফাইনালে দেখা হল তামিলনাড়ুর। প্রথম গেমটায় ১১ পয়েণ্ট পর্যন্ত গিয়ে বাংলার ছেলেরা কেমন যেন ফুরিয়ে গেল। দ্বিতীয় গেমে শুধু কোর্টে তারা দাঁড়িয়ে ছিল। একটাও পয়েণ্ট করতে পারল না। তামিলনাড়ু তাদেরকে বোবা করিয়ে দিয়েছে। তামিলনাড়ুর কাছে এরকম অপমানে বাংলার ক্যাম্পে ছেলে-মেয়ে দু পক্ষেরই মনে সমান চোট লেগেছে। মেয়েরা প্রতিজ্ঞা নিয়েছে সন্ধ্যায় দেখা যাবে, এ অপমানের রিটার্ন দেওয়া যায় কি না। খেলার ঠিক আগেই বাংলার মেয়েরা কোর্টের চারপাশে অনুশীলনের সময় নানারকম জিমন্যাসটিকসের ভড়কি দেখাতে লেগেছে। বেশ কিছুক্ষণ তামিলনাড়ুর কোচ আর মেয়েরা প্র্যাকটিস ছেড়েছুড়ে বাংলার মেয়েদের জিমন্যাসটিকস দেখতে মজে যায়। আসলে বাংলার মেয়েরা ভড়কি দিলেও মনে মনে গজরাচ্ছিল—সকালের শোধ নেবই। নিয়েছেও।

খেলা আরম্ভ হতেই বাংলার খুকীরা তামিলনাড়ুকে কোণঠাসা করে। সবাইয়েরই নির্ভুল খেলা। খেলা কিছু গড়াতেই মনে হল তামিলনাড়ুর মেয়েরা যেন প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামেনি। তারা দর্শক। হরবখত ভুলের খেলা খেলে চলেছে। প্রথম গেম যেন কোথা দিয়ে শেষ, মাত্র তিনটি পয়েণ্ট তারা বাংলার কাছ থেকে নিতে পেরেছে। দ্বিতীয় গেমেও তাদের দুর্বলতার কোন হেরফের নেই। সারা গেমে কুড়িয়েছে তারা একটি মাত্র পয়েণ্ট। সকালের সেই মন-খারাপ অবস্থাটা সন্ধ্যায় বাংলার খোকা-খুকুদের আর জেরবার করতে পারল না। সমস্ত কৃতিত্বটাই কিন্তু খুকীদের। ভোজবাজির মত খেলার ভোল পাল্টাতে পারে বাংলার ওই খুকী ভলিবলার টিম। ওদের চিনে রাখা দরকার।

বাংলার খুকী-ভলিবলারদের বয়স এগারো থেকে চোদ্দর মধ্যে। টিমের প্রতিটি প্লেয়ারের কিছু-না-কিছু গুণ আছে, যার অনুশীলন করে তারা ভবিষ্যতে বড় প্লেয়ার হতে পারে। দলের ক্যাপটেন তাপসী চৌধুরী এখুনি চৌখস ভলিবলার। এমনিতে শান্তশিষ্ট, কিন্তু বল নেটের উপরে মাপসই উঠলে তাপসী চাপ মারবেই। জিমন্যাসটিকসের নানান কসরত অনায়াসে সে যখন-তখন দেখাতে পারে। ঝুনু সাহা, যোগমায়া কোলে ও শ্রাবণী নিয়োগীও জিমন্যাসটিকসে পোক্ত। এ'দের মধ্যে ঝুনু ও যোগমায়া একটু চুপচাপ। শ্রাবণীর আদুরে নাম বুড়ী। ভলিবলারের বিশেষ দায়িত্বের দিকটা সে এখনই টের পেয়েছে। কোর্টে খেলার সময় যাকে বেশী বকবক করতে দেখবে, জানবে সে-ই বুড়ী। মুখ বুজে যোগমায়া নেটের কাছ-বরাবর তাপসী অথবা মিঠুকে বল জুগিয়ে দিয়েছে। মিঠু বড় লাজুক। খেলার সময় তাপসী অথবা মানসী মুখার্জীর চাপ মারার কাজ ফুরোলেই মিঠুর ডাক পড়ে দায়িত্ব নেওয়ার জন্য। মানসী ফিটফাট মেয়ে। সে সবসময় সুযোগ খোঁজে আচমকা কীভাবে বিপক্ষের কোর্টে স্পাইক (চাপ মারা) করা যায়। এদের পাশে ইতি রাহাকে বড় ঠাণ্ডা মনে হয়। ম্যাক্সি পরা মিনি-ভলিবলার। খেলার সময় ওর একমাত্র ধান্ধা — কীভাবে নেটের-কাছ-ঘেঁষে-দাঁড়ানো স্পাইকারকে সাহায্য করতে পারি। বড় খবর—তাপসী, ঝুনু, যোগমায়া, মিঠু, সর্বাণী, ইতি ও মানসী এশিয়ান মিনি ভলিবলে ভারতের হয়ে খেলার জন্য অনুশীলন শিবিরে ডাক পেয়েছে। টিমের বাকী কজনের অবদানও অবশ্য কম নয়। ওদের পাশে সুপ্রা রায়, মুনমুন দে, পূর্ণা বন্দ্যোপাধ্যায়, রেশমী ঘোষের খেলার ঝিলিকও হায়দরাবাদের দর্শকদের চোখ ধাঁধিয়ে দিয়েছে।

কলকাতার ময়দানে ওদের আনাগোনা হলেও সবাই কিন্তু কলকাতার মেয়ে নয়। শ্রীরামপুর, চন্দননগর, ভদ্রেশ্বর, নৈহাটি প্রভৃতি নানা জায়গা থেকে ওরা এসেছে। আর রাতারাতি চ্যাম্পিয়ন হয়ে গড়ে ওঠেনি। মেহনত আছে প্রচুর। ফেডারেশন মাঠে মিনি-ভলিবল কম্পিটিশনে যোগ দেওয়া তো আছেই। এ ছাড়া ওই টিমটিতে চানস পেতে মোট প'য়ষট্টি জন খুকু এসেছিল অনুশীলন-শিবিরে যোগ দিতে। কাট ছাঁট করে ১২ জনের টিমটি শেষমেষ পাওয়া যায়। এক মাসের ট্রেনিংয়ে কোচ শিবশঙ্কর চট্টোপাধ্যায় ওদের ভলিবলের চোখ ফুটিয়ে দিয়েছেন। হায়দরাবাদে ফতে ময়দানে ওরা কিস্তি মাত করে আসায় উনি বুক বাজিয়ে বললেন, ভবিষ্যতে ওরা হারিয়ে যাবে না, এরকম চ্যাম্পিয়ন হওয়ার কৃতিত্ব ওরা বারবার দেখাতে পারবে।

বাপ কা বেটা

রমেশ কেমন খেলছে?
কেমন লাগছে আপনার?
বড় হয়ে কেমন খেলবে?

প্রায়ই এই তিনটি প্রশ্নে রামনাথন যেন নিভে যান। নেহাতই চিঁচিঁ গলায় উত্তর দেন, ওই একরকম খেলছে। মন্দ লাগছে না, তবে বয়স ত একরত্তি, এখন...।

তখন মাত্র ষোল বছর বয়স, রামনাথন কৃষ্ণন সেই বয়সেই জাতীয় চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন। তাঁর ছেলে রমেশ সেই বয়সটা থেকে এখন দু-বছর দূরে। ভারতীয় টেনিস মানে কৃষ্ণন—এটা লাখ কথার এক কথা। এই তো, বছর পাঁচেক আগেও ওই দামী কথাটা ষোল-আনা দামীই ছিল। এখন কিন্তু ভারতীয় টেনিসে দুই অমৃতরাজ ভাইয়ের দারুণ দাপট। তবে অনেকের মনেই মাঝে মাঝে কথাটা উঁকি দেয়—রমেশের মধ্যেই রামনাথনকে আবার ফিরে পাওয়া যাবে!

মুখ ফুটে কৃষ্ণন অমন কথা ভুলেও উচ্চারণ করেন না। অদ্ভুত মাপসই ব্যাপার, রমেশ কিন্তু বাপের খেলা অবিকল আয়ত্ত করেছে। ব্যাকহ্যাণ্ড, ফোরহ্যাণ্ড গ্রাউণ্ড স্ট্রোক, প্লেসিং—কৃষ্ণনের সব গুণ নিয়ে রমেশ এখুনি হাজির। খেলোয়াড়ী দুষ্টুমি এরই মধ্যে ওর র‍্যাকেটে খেলছে। খেলাতে খেলাতে প্রতিদ্বন্দ্বীকে নেটের কাছে টেনে আনে, এই তো মওকা, টুপ করে বলটি লব করে দেয় প্রতিপক্ষের মাথা টপকে সেই বেস লাইনে। প্রতিদ্বন্দ্বী তখন ফ্যাল-ফ্যাল করে তাকায়।

এরই মধ্যে রমেশ টুর্নামেন্ট জেতার স্বাদ পেয়েছে। র‍্যাকেট ঘুরিয়ে এসেছে বেলজিয়াম, হল্যাণ্ড ও পোল্যাণ্ডের কোর্টে। ভারতীয় ডেভিসকাপ টিমের কোচ আখতার আলি রমেশের খেলা সম্পর্কে দারুণ আশাবাদী। ওকে প্র্যাকটিস দিতে আখতারের আলস্য আসে না। আর কিছুদিন বাদে রমেশ লম্বায় বাবার মাথা ছাড়িয়ে যাবে। চেহারাটা সেই বাপের মতই নরম নরম। অনুশীলনে খুব খাটিয়ে। বাবা চেহারাটা চাবুক বানাতে চান। রমেশের মুখে সব সময়ই হাসি মাখানো। ম্যাচের সময় বাবা কোর্টের ধারেকাছে থাকলেই মুশকিল—রমেশের হাসি তখন কর্পূর।

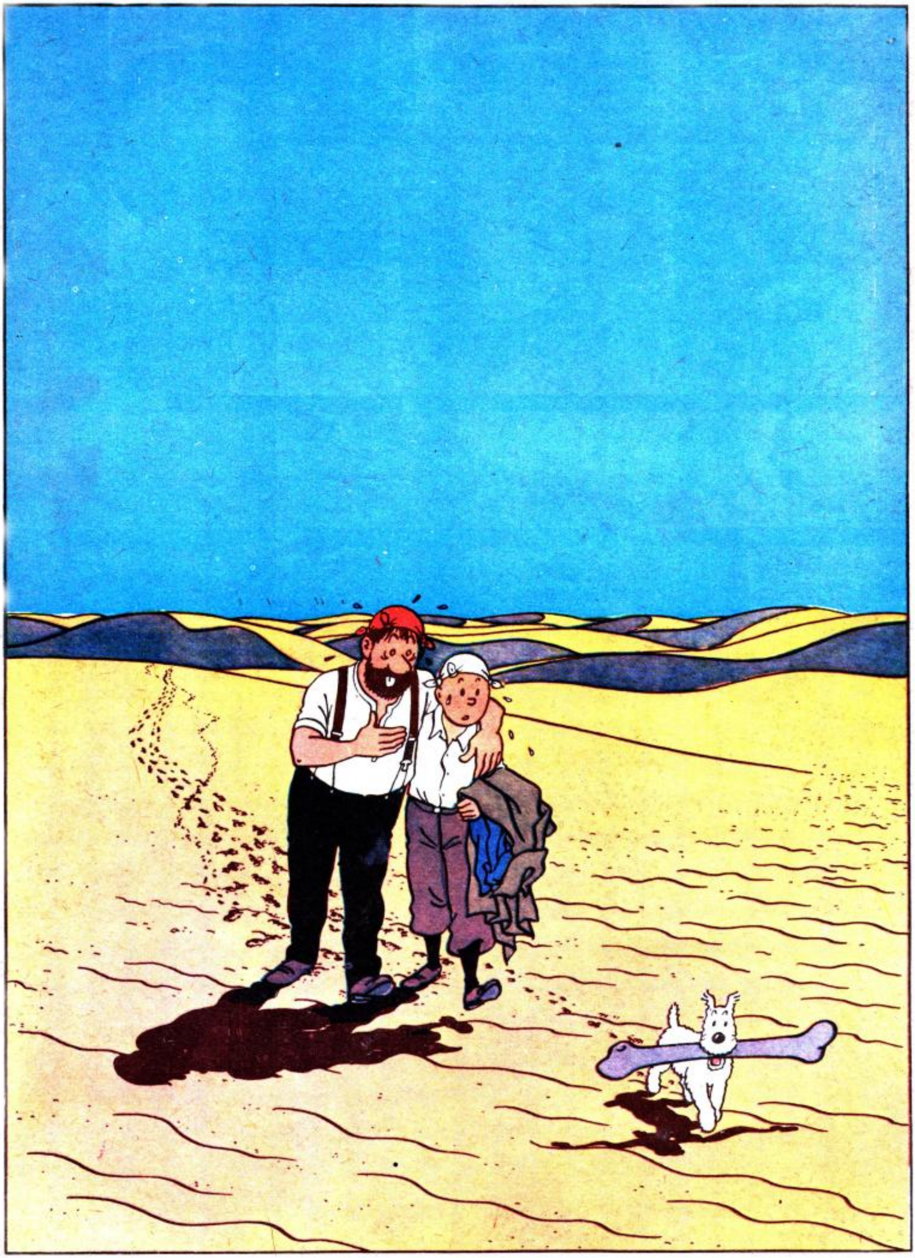

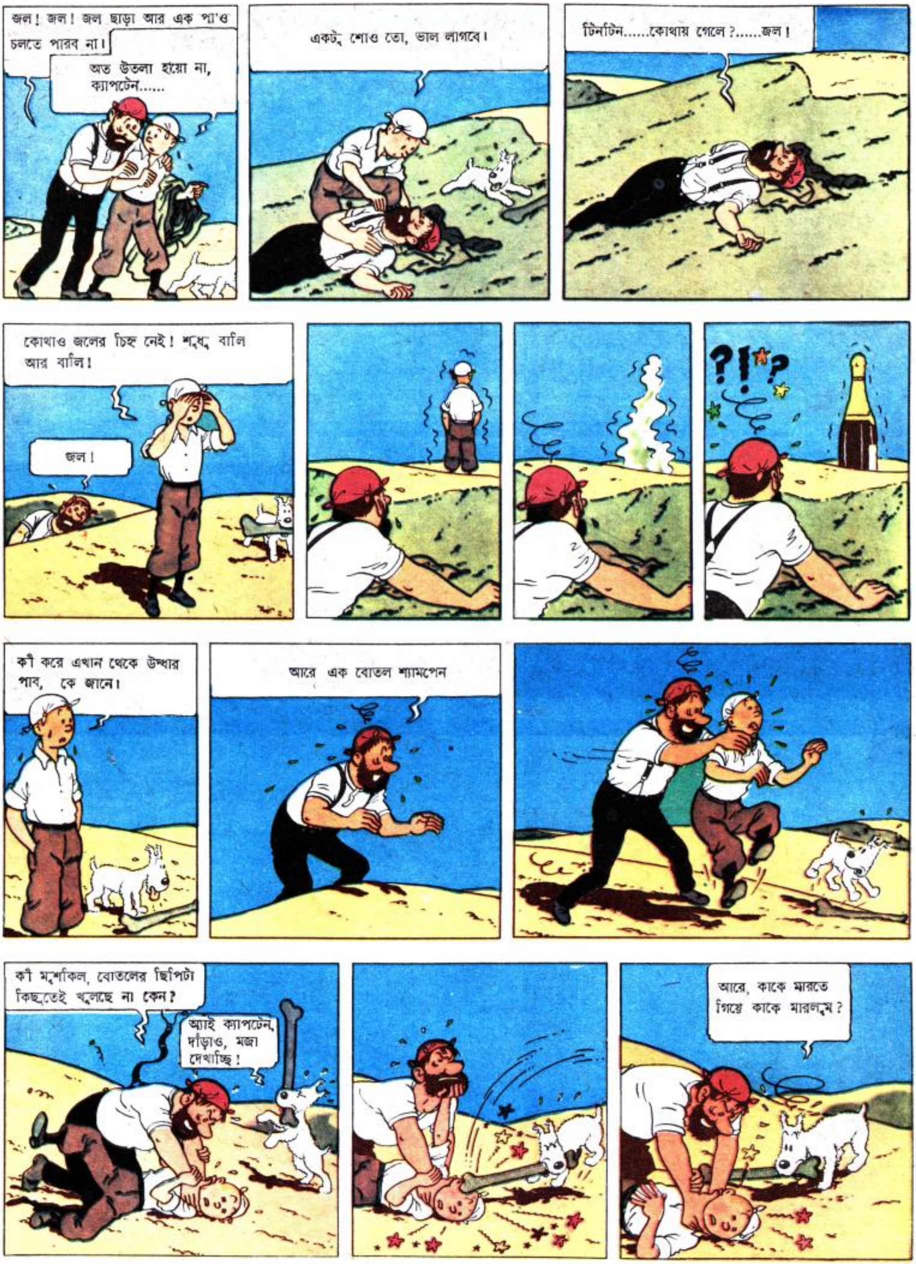

এর পর পঞ্চাশের পাতায়

পরাজিত রাজা

উমা দাশগুপ্ত

উইলিয়ম শেক্‌স্‌পীয়র তাঁর 'তৃতীয় রিচার্ড' নাটকে এক ভয়াবহ শয়তানের ছবি এঁকেছেন। ইংল্যান্ডের রাজা তৃতীয় রিচার্ড প্রায় পাঁচশো বছর আগে সিংহাসন জয় করেন। শেক্‌স্‌পীয়রের রিচার্ড অমানুষ। তিনি যখন রাজা হন, তখন চার দিকে হাহাকার পড়ে যায়। অনেক নিষ্ঠুর কাণ্ড করে তিনি রাজা হন। দুই কিশোর ভাইপোকে হত্যা করেছিলেন তিনি লণ্ডনের সেই কুখ্যাত 'টাওয়ারে'। এ-সবকিছু করেছিলেন একমাত্র রাজা হবার এবং রাজা থাকবার উদ্দেশ্যেই। যুবক-বয়স থেকেই নাকি তাঁর এই আকাঙ্ক্ষা ছিল। ওই সময় থেকেই তিনি নানা হত্যার ষড়যন্ত্রে নিজেকে জড়িয়েছিলেন। রূপকথার সুন্দর জগতে তাই রিচার্ড চিরদিনের মত কুৎসিত হয়ে রইলেন। শিল্পীদের হাতে আঁকা সমস্ত ছবিতেই তাই রিচার্ডের চোখে ভয়, তাঁর পিঠে কুঁজ। রিচার্ড অবশ্য বেশীদিন রাজত্ব করেননি। মাত্র দুবছর রাজা থাকবার পরেই বস্‌ওয়ার্থের বিখ্যাত যুদ্ধে, তাঁরই সম্পর্কে-জামাই হেন্‌রি রিচমণ্ডের কাছে তাঁর হার হয়েছিল।

বস্‌ওয়ার্থের পরাজয়ের পিছনে এক ঘোড়ার গল্প। যুদ্ধক্ষেত্রে যখন শত্রুদল তৈরী, রিচার্ড তাঁর প্রিয় ঘোড়ায় চড়ে যুদ্ধে যাবেন বললেন। হুকুম দিলেন সেই ঘোড়ার পায়ে নতুন নাল লাগাতে। রাজার রাজত্বে কিন্তু একজনই কামার। রিচার্ডের ঘোড়া যখন তার দোকানে গেল, কামারের হাতে তখন মাত্র তিনটি পেরেক। চতুর্থ নালটির জন্য আরো একটি পেরেক লাগবে। অথচ এ-সব করবার সময় কই, রাজা যে অপেক্ষা করছেন। সহিস করল কী, রাজার ভয়ে ঘোড়ার তিন পায়ে ঠিকমত নাল পরিয়ে দিয়ে চলে গেল। ভাবলো কে আর লক্ষ্য করবে? সময়মত ঘোড়া পেলেই হল, সহিসের তো তাতে প্রাণ বাঁচবে। রাজার সর্বনাশ অনিবার্য হল। যুদ্ধের প্রথমেই ঘোড়ার সেই পেরেকবিহীন চতুর্থ নালটি খুলে গেল। ঘোড়া পড়লো, রাজাও পড়লেন। রিচার্ডের আর যুদ্ধ করবার উপায় রইল না। যুদ্ধক্ষেত্রে মাঝে-মাঝে শুধু তাঁর আর্তনাদ শোনা গেল। "একটা ঘোড়া, একটা ঘোড়া,

"একটা ঘোড়ার জন্য যে আমার রাজত্ব গেল!" রিচমণ্ড তো আর সে-কথা কানে তোলেননি। যুদ্ধের শেষে তিনি হলেন ইংল্যানডের প্রথম 'টিউডর' রাজা, সপ্তম হেনরি। অন্য দিকে পরাজিত রাজাকে নিয়ে তাঁর দেশের লোক এক মজার ছড়া তৈরী করলো :

পেরেকের অভাবে নাল গেল।
নালের অভাবে ঘোড়া গেল।
ঘোড়ার অভাবে সওয়ার গেল।
সওয়ারের অভাবে যুদ্ধ গেল।
যুদ্ধের অভাবে রাজত্ব গেল।
পেরেকের অভাবে সব গেল!

দেশের লোক ছড়া কাটলো। শেকস্‌পীয়র নাটক লিখলেন। বহুদিন পর্যন্ত ঐতিহাসিকদের কাছেও রিচার্ড শয়তান রূপেই থেকে গেলেন। এর প্রধান কারণ অবশ্য টিউডর রাজবংশ। সিংহাসনে সপ্তম হেনরির জোরালো দাবি ছিল না। তাঁকে যারা চেয়েছিলেন, তাঁরা তাই বললেন যে, রিচার্ড অমানুষ ছিলেন, তাঁর আমলে দেশের লোক খুব দুর্দশায় পড়েছিল, সপ্তম হেনরি ইংল্যাণ্ডকে বাঁচিয়েছেন। সেজন্যই টিউডর রাজাদের দরবারী ঐতিহাসিকেরা রিচার্ডকে শয়তান বানালেন। ছবিতে রিচার্ডের চোখে ভয় ঢুকলো। রিচার্ডের পিঠে কুঁজ উঠলো। পরের যুগের ঐতিহাসিকেরা অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে তবেই এই ঐতিহাসিক রূপকথাটিকে ছেড়ে সত্যের দিকে এগিয়েছেন।

সত্য হল এই যে, রিচার্ডের মধ্যে ভালও ছিল, মন্দও ছিল। রিচার্ড যে ভাল রাজা, সার্থক রাজা হতে চেয়েছিলেন তা নিঃসন্দেহেই বলা যায়। ছবি ভালবাসতেন, গান ভালবাসতেন, সুন্দর সাজপোশাক ভালবাসতেন। দুঃখী প্রজাদের প্রতি তাঁর বিশেষ করুণা ছিল। তাদের সমস্ত আবেদন, সমস্ত প্রার্থনা সযত্নে বিচার করতেন। সচরাচর তাদের খালি হাতে ফেরাতেন না। রিচার্ডের সময়ে যাঁরা লিখেছেন (টিউডর ঐতিহাসিকদের কথা তোমরা এখন ভুলে যাও), তাঁরা সকলেই এ কথা বলেছেন। অথচ তিনি সার্থক রাজা হননি। স্পষ্টতই যে-দুটি বছর তিনি রাজা ছিলেন, আতঙ্কের মধ্যেই দিন কাটিয়েছিলেন। ইংল্যাণ্ডের বড় লোকেরা রিচার্ডের জীবন অতিষ্ঠ করে তুলেছিলেন। আর তাদের উসকাতেন রিচার্ডের বৌদি, চতুর্থ এডওয়ার্ডের বিধবা রানী। চতুর্থ এডওয়ার্ড হঠাৎ মারা যান; তাঁর দুই পুত্রকে ভাই রিচার্ডের আশ্রয়ে রেখে। রিচার্ডও তাঁর দাদার বিশেষ ভক্ত ছিলেন। তাঁর ভাইপোদেরও তিনি তাঁর দাদার শেষ ইচ্ছা অনুযায়ী যত্নে রাখতে চেয়েছিলেন। কিন্তু রানীর দলের ষড়যন্ত্রীরা তৃতীয় রিচার্ডকে এক মুহূর্তের জন্যও নিশ্চিন্ত থাকতে দেননি। শেষ পর্যন্ত রিচার্ড ভয় পেয়ে তাঁর বুদ্ধি হারিয়েছিলেন। মনে করেছিলেন, ওই দুই ভাইপোকে জীবনের মত সরিয়ে ফেললেই বুঝি তাঁর শান্তি আসবে। এই ভুল থেকেই তিনি অনেক জঘন্য অন্যায় করে ফেলেছিলেন। রূপকথা, ইতিহাস কোনোটাই তাঁকে ক্ষমা করতে পারেনি। রূপকথায় তিনি চিরশয়তানই রয়ে গেলেন। ইতিহাস অনেক দিন পরে অবশ্য তাঁর হারিয়ে যাওয়া ভালটুকু খুঁজে বের করেছে। যদি আমরা এটা মেনে নিই যে, মানুষ ভালয়-মন্দয় মেশানো, তাহলে বোধহয় রিচার্ডের সব চাইতে বড় দোষ হয়েছিল এই যে, তিনি যুদ্ধে হেরে গিয়েছিলেন। পরাজিত রাজার কিন্তু একটা খুনও মাফ হয় না, সাত খুন তো দূরের কথা।

ম্যাজিকের মত / পার্থসারথি চক্রবর্তী

ছোট্ট একটা খেলনা-পাখি তার নিজের খেয়াল-খুশিমতো ঠোঁট ডুবিয়ে জল খাচ্ছে, আবার জল খাওয়া শেষ হলে আপনা থেকেই মুখ তুলে নিচ্ছে—ব্যাপারটা খুব মজার নয় কি? কোথাও কিছু নেই, অথচ এই খেলনা-পাখি বারেবারে তার নিজের ঠোঁট জলে দেবে, আবার মুখটাকে তুলে নিয়ে আগের অবস্থায় ফিরে আসবে। এই প্রক্রিয়া অনবরত চলতে থাকলে বাস্তবিক অবাক হবারই কথা।

এই খেলনা-পাখির মাথা হচ্ছে একটা কাঁচের গোলক, দেহটা কাঁচের নলে তৈরী। আর এই নলের খোলা মুখটা ঢুকানো রয়েছে নীচের বড় একটা কাঁচের গোলকের ভিতর।

ছবিতে যেমন দেখানো হয়েছে, সেইভাবে তুলো দিয়ে তোমরা এই খেলনা-পাখির ঠোঁট, চোখ ও মাথার টুপি তৈরি করতে পারো। কাঁচের জিনিস তৈরি করে এমন কারখানায় গিয়ে বললে তারা সহজেই তোমাদের এই রকম একটা পাখি বানিয়ে দেবে। খুব পাতলা প্লাইউড কেটে তার থেকে খেলনা-পাখিকে ধরে রাখবার জন্য দুটো দেওয়াল তৈরি কর। এর তলায় একটা কাঠের পাটাতনও থাকবে।

কেন এই পাখি বারে বারে জলে তার ঠোঁট ডোবায় ও তুলে নেয়, এবার তা বলছি। খেলনা-পাখির নীচের বড় গোলকটা কাঁচ-নলের খোলামুখের কিছুটা উপর পর্যন্ত ইথার দিয়ে ভর্তি করা হয়েছে। যেহেতু নীচের এই গোলক উপরটার চেয়ে ভারী তাই পাখিটা

কিছুক্ষণের জন্যে খাড়া অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকে। এরপর ঐ ইথার কাঁচের নল দিয়ে আস্তে আস্তে উপরের ছোট গোলকের দিকে উঠে আসে। সেইসঙ্গে পাখির মাথাটাও ক্রমশ নিচু হয়ে জলের মধ্যে ঠোঁট ডুবিয়ে দেয়। এটা করার সময় মাথার তুলোটাও যায় ভিজে।

পাখিটা অনুভূমিক অবস্থায় চলে এলে কাঁচ-নলের নীচের খোলা মুখটা বড় গোলকের ইথারের উপরের অংশ থেকে খানিকটা উঁচুতে উঠে পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে কাঁচ-নলের ইথার নীচের বড় গোলকে চলে আসবে, আর সেই-সঙ্গে আমাদের খেলনা-পাখিও খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে যাবে। অর্থাৎ ইথারের উপর-নীচ করার ফলেই পাখির মুখ জলের দিকে এগিয়ে যায় ও সরে আসে।

কিন্তু কেন ইথার ম্যাজিকের মতো একবার উপরে ওঠে, আর একবার নীচে নামে বলতে পার? ইথার সাধারণ উষ্ণতায় খুব সহজেই বাষ্পীভূত হয়। ইথার বাষ্পের এই চাপ তাপমাত্রার সঙ্গে খুব সহজেই বদলে যায়। খেলনা-পাখির মাথার গোলকের তাপমাত্রা নীচের বড় গোলকের তাপমাত্রার চাইতে কম থাকে। আবার কাঁচ-নলের সম্পৃক্ত বাষ্পের চাপ কমে যাওয়ার জন্য ইথারের উপরে ওঠা ছাড়া আর অন্য কোনও পথ খোলা থাকে না। পাখির মুখ এই জন্যেই উপর-নীচ করতে পারে।

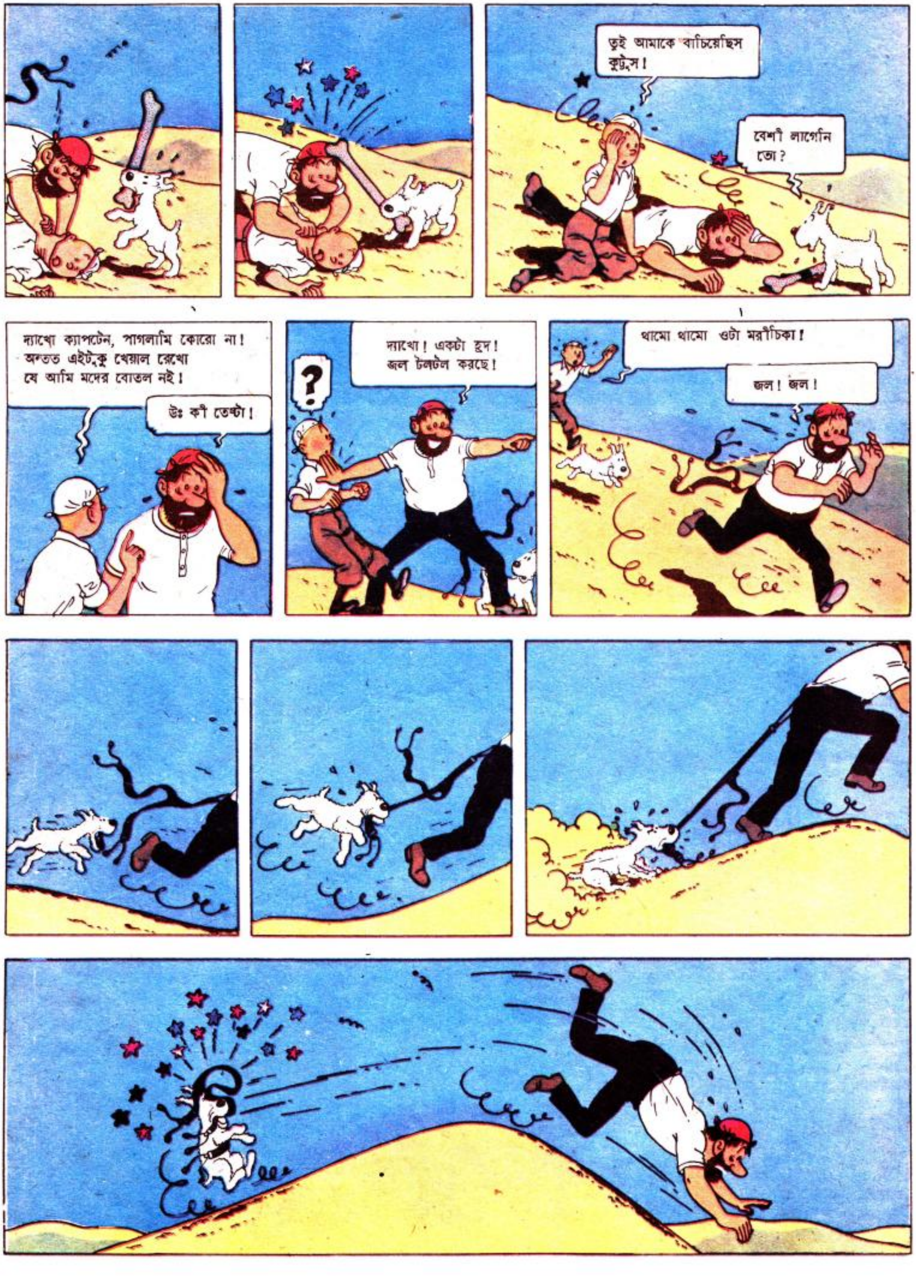

তুই আমাকে বাঁচিয়েছিস কুট্‌স!
বেশী লাগেনি তো?
দ্যাখো ক্যাপটেন, পাগলামি কোরো না! অন্তত এইটুকু খেয়াল রেখো যে আমি মদের বোতল নই!
উঃ কী তেষ্টা!
?
দ্যাখো! একটা হ্রদ! জল টলটল করছে!
থামো থামো ওটা মরীচিকা!
জল! জল!

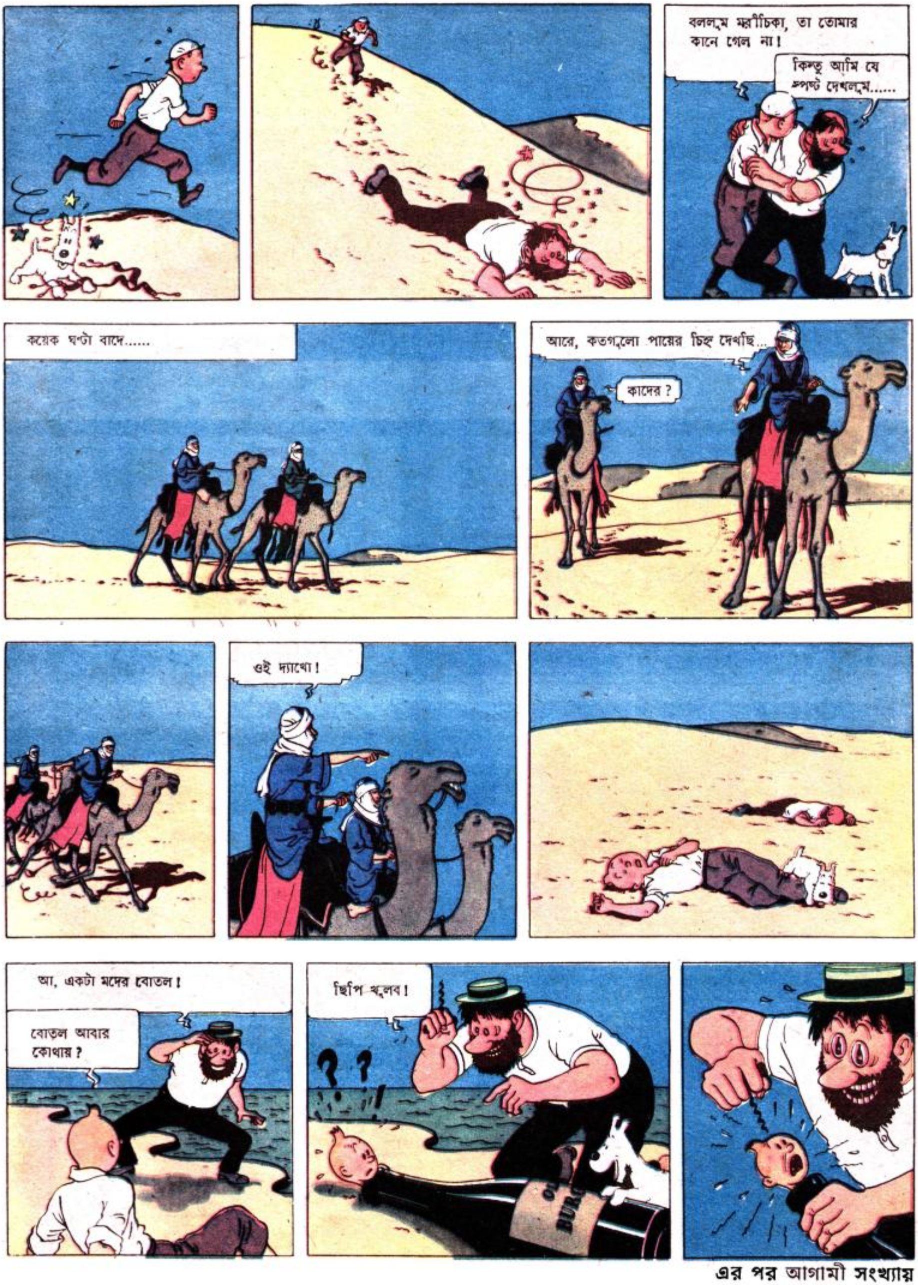

এর পর আগামী সংখ্যায়

হাতি পর হাওদা
ঘোড়া পর জিন্
জলদি আও জলদি আও
ওয়ারেন হেস্টিন।

খুব মজাদার ছড়া,—তাই না? হাতির পিঠে হাওদা খাটিয়ে ওয়ারেন হেস্টিংস চলেছেন। সঙ্গে ঘোড়ার পিঠে অন্যরা। ওয়ারেন হেস্টিংস প্রথম গভর্নর জেনারেল। যাকে বলে—বড়লাট। তিনি হাতির পিঠে চড়বেন বই কী। হাতি রাজার বাহন। লাটবাহাদুরেরা তাই আমাদের দেশের রাজা-রাজরাদের স্টাইলে যখন-তখন হাতি চড়ে ঘুরে বেড়াতেন। কখনও চললেন মিছিলে; কখনও হয়তো কোনও রাজার সঙ্গে দেখা করতে, কখনও বা শিকারে। সেকালে হাতি ছাড়া একদিনও চলত না ওঁদের। এক সময় একা লাটসাহেবেরই হাতি ছিল একশো ছেচল্লিশটি। দেখবার মতো তখন সরকারী হাতিখানা।

তারপর হঠাৎ এক সময় হাতির খাতির কমে গেল। এক কারণ—দেশে চালু হয়েছে রেলগাড়ি। আর এক কারণ হাতি-পোষার খরচ। সাহেবরা হিসাব করে বললেন পোষায় না। যেমন-তেমন একটা হাতিখানা রাখতে গেলেও বছরে কমপক্ষে আড়াই লাখ টাকার মামলা। সুতরাং, তিরিশ চল্লিশ বছরের মধ্যেই একশো ছেচল্লিশ থেকে কমে লাটসাহেবের হাতির সংখ্যা এসে দাঁড়াল পঁয়ত্রিশে। বড়লাট তখন লর্ড ডাফরিন। ল্যান্স-ডাউনের আমলে দেখা গেল, হাতিখানায় হাতি রয়েছে মাত্র তিনটি। তার মধ্যে একটি খুবই বুড়ো, একশো কুড়ি বছর আগে ওয়ারেন হেস্টিংস নাকি সাঁতাই চড়েছিলেন তার পিঠে। তখনই হয়তো মুখে-মুখে রটেছিল ওই ছড়া। একদিন গঙ্গা পার হতে গিয়ে ভেসে গেল বেচারা। হাতে রইল দুই। লর্ড এলগিন এসে দেখলেন হাতিখানায় হাতি আছে মোটে একটি। কার্জনের আমলে সবে-ধন নীলমণি সেটিকেও খুঁজে পাওয়া গেল না আর।

হাতি নেই। কিন্তু তখনও রয়েছে লাটবাহাদুরদের হাতিখানার স্মৃতিচিহ্ন বাহারী ওই হাওদাটি। নানা ধরনের কারুকার্য করা রুপোর গড়া হাওদা। গড়িয়েছিলেন লর্ড ডালহৌসি। খরচ পড়েছিল তখনকার দিনে হাজার তিরিশেক টাকা। তাই নিয়ে বিলেতে সে কী হল্লা!—এই লাটসাহেবি কি বাড়াবাড়ি নয়? ডালহৌসি উত্তর দিয়েছিলেন, আর যাই হোক, রংচং-করা কাঠের একটা নড়বড়ে হাওদা খাটিয়ে তো আর বড়লাট হাতি চড়তে পারেন না। লোকে যে হেসে খুন হয়ে যাবে! আমার মাহুত পর্যন্ত বাজে হাওদার সামনে বসতে রাজী নয়!

বেশ কিছুকাল পরে আর-একজন লাটসাহেব নতুন-কিছু কাজ করিয়েছিলেন হাওদাটির ওপর। তার ওপরে কারিগরি করিয়েছেন লর্ড কার্জনও। তাঁর আমলেই এটি রাখা হয়েছিল সিমলায়, বড়লাটের প্রাসাদে। এখন কোথায় আছে, সঠিক জানি না। অনেকেই বসেছেন হাতির-পিঠে বসানো এই সিংহাসনে। তবে সবচেয়ে মারাত্মক অভিজ্ঞতা লর্ড হার্ডিঞ্জের। কলকাতার বদলে সবে রাজধানী হয়েছে দিল্লি। বড়লাট হার্ডিঞ্জ হাতির পিঠে চড়ে ঢুকছেন নতুন রাজধানীতে। শোভাযাত্রা যখন চাঁদনিচকে, এমন সময় হঠাৎ বোমার আওয়াজ। বড়লাটকে লক্ষ্য করে বোমা ছুঁড়েছে কেউ। দেখা গেল, লাট-বাহাদুর ঠিকই আছেন, কিন্তু তাঁর মাথার ওপরের ছাতাটি ভেঙে পড়েছে,—হাওদাটিও ক্ষতবিক্ষত!

শ্রীপান্থ

অমিতেন্দু পালিত (৭ বছর)

তোমাদের পাতা

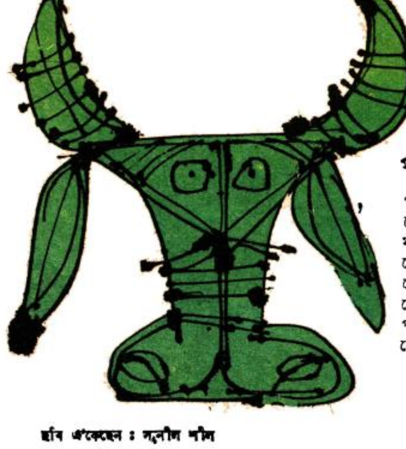

ছবি এঁকেছেন : সুনীল শীল

খাই-খাই

রাম শ্যাম দুই ভাই
করে শুধু খাই খাই
তাদের যে বোন আছে
চড়ে থাকে গাছে গাছে
গাছের ফলের আশায়
রাতেও সে ফেরে না বাসায়।

ঝুমকা ভাদুড়ী
(বয়স—নয়)

তোমাদের চিঠি

আমি সব আনন্দমেলাই পড়েছি। টিনটিন, টারজানের ছবি, হুপা, ধাঁধা, ছড়া, গল্প রাজায় রাজায় খুব ভাল। আমি অনেক গল্প, ছড়া লিখেছি। আমি 'রাজায় রাজায়' সব জানি। আমার সঙ্গে দাবা খেলায় কেউ পারে না। বাবা জেঠুও এখন হেরে যায়। আমি আপনার সঙ্গে দাবা খেলতে যাব। বাবাকে বলেছি। আমি কবে আপনার সঙ্গে খেলতে যাব লিখবেন।

অশেষকৃষ্ণ দত্ত
(বয়স—সাত)

আমি আনন্দমেলার একজন গ্রাহক। ভাদ্র সংখ্যার 'রবিনহুডের রাজা' পড়ে খুব ভাল লেগেছে। কিন্তু একটা ব্যাপারে খটকা লেগেছে। ওখানে আছে যে সালাদীনের ছেলের নাম এল-আদিল। কিন্তু বাবা বলেছেন এল-আদিল সালাদীনের ভাই ছিলেন, ছেলে নন। আমেরিকান ঐতিহাসিক Baron Lamb-এর লেখা The Crusades নামে বইয়ে একথা লেখা আছে। আমিও দেখেছি। এখন, কোন্‌টা ঠিক?

—শুভদীপ চৌধুরী
(বয়স ১০)

তোমাদের ধাঁধা

তুমি থাকো জলে, আমি থাকি ডালে,
দেখা হবে দু'জনার মরণ কালে॥
উত্তর—ইলিশ মাছ ও লঙ্কা।

—জয়ন্ত কর (বয়স—১২)

পদ্য-টদ্য

গরু বাছুর,
কেউ বা টরু কেউ বা টাছুর॥
মহিষ বলদ,
কেউ বা টহিস কেউ বা টলদ॥
মোরগ মুরগী,
কেউ বা টোরগ কেউ বা টুরগী॥
পদ্য ছড়া,
কেউ বা টদ্য কেউ বা টড়া॥

নন্দনা সেন
(বয়স—সাত)

আমাদের বাবুন

এক যে ছিল ছেলে তার নামটি ছিল বাবুন,
চাঁদের থেকে বলে, সবাই রকেটে করে নামুন
লোকরা সব বলে নামছি গো নামছি।
দেখছ না কিরকম দরদরিয়ে ঘামছি,
আর ঐ দেখনা আসছে বুঝি
জাইনী বুড়ি থামছি!

চিত্রলেখা বসু
(বয়স—আট)

আজব চিড়িয়াখানা

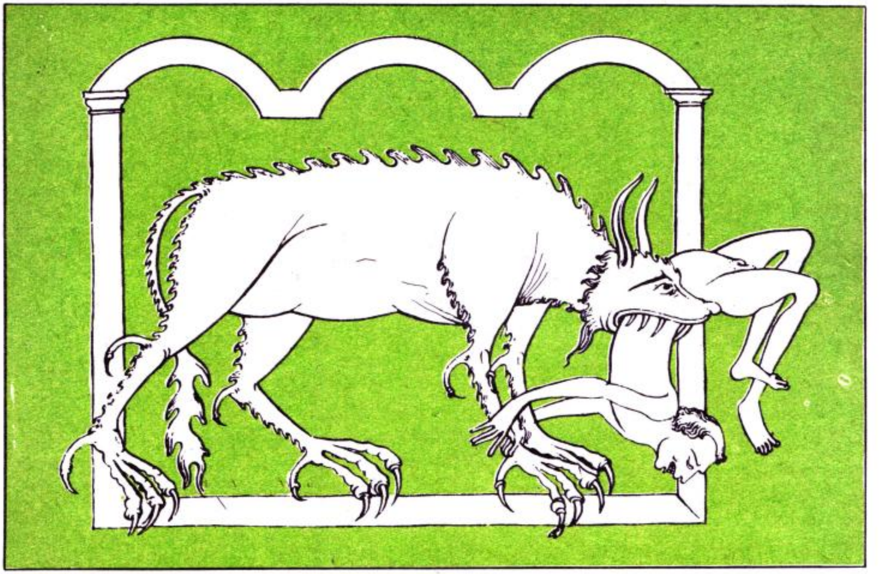

—আহা, লোকটাকে বুঝি খেয়েই ফেলল!

যা রাক্ষুসে জন্তু! ছুঁচলো দাঁত, আর নখ। করাতের মতো পিঠ, করাতের মতো লেজ। পায়ে কাঁটা, গায়েও কাঁটা। দেখলে গায়ে কাঁটা দেয়। ধরেছে যখন, আর নিস্তার নেই। ইচ্ছে করছে হাতের কাছে যা আছে তা-ই ছুঁড়ে মারতে,—তাই না?

অবশ্য এমনও হতে পারে যে, লোকটা আসলে সার্কাসের খেলোয়াড়। খেলা দেখাচ্ছে। তাহলে তো কথাই নেই, মুখ থেকে বার হয়ে এলে আমরা হাঁফ ছেড়ে বাঁচি।

কিন্তু সে-ধরনের কোনও সম্ভাবনা আছে বলে তো মনে হয় না। কারণ এটা নাকি কুমির। বাঘ সিংহ নয়, কুমির। চোখে দেখার আগে স্রেফ কানে শুনে আঁকা কুমির। এঁকে-ছিলেন রোমের এক শিল্পী। কুমির নিয়ে খেলা তো পরের কথা, রোমানরা তখনও কুমির চোখেই দেখেননি। কেঁদো-কুমির, মেছো-কুমির—কিছুই না। কানাঘুষোয় কুমিরের খবরটা মোটামুটি জেনে গেছেন এই পর্যন্ত।

একজন রোমান পণ্ডিত লিখলেন—মিশরের নীল নদে এক ভয়াবহ জন্তুর বাস। তারা লম্বায় তিরিশ ফুট পর্যন্ত হতে পারে। গায়ের রঙ হলদেটে, অনেকটা জাফরানের মতো। তারা উভচর। রাত্তিরে জলে থাকে, দিনের বেলায় উঠে আসে ডাঙায়। ডাঙাতেই ডিম পাড়ে। ডিম থেকে বাচ্চা হয়। কুমির অত্যন্ত হিংস্র। ধারালো তাদের দাঁত আর নখ। গায়ের চামড়া খুবই শক্ত। বড় বড় পাথর ছুঁড়ে মারলেও ওদের লাগে না। মজার ব্যাপার এই, খাওয়ার সময় ওদের ওপরের চোয়াল ওঠানামা করে, কিন্তু নীচের চোয়াল একদম নড়ে না।

তাও কি কখনও হয়? তবে এসব ছোটখাটো ভুলের জন্য তাঁকে দোষ দিয়ে লাভ নেই। তিনি তো তবু কুমিরের মোটামুটি একটা খসড়া দিতে পেরেছেন। তার অনেকদিন পরে কিন্তু আর-এক পণ্ডিত লিখে-ছিলেন—ডিম ফোটার পর যে বাচ্চা-গুলো জলে নেমে যায়, বড় হয়ে সেগুলো হয় কুমির; আর যারা ডাঙায় থেকে যায়, তারা হয় গোসাপ কিংবা গিরগিটি।

যা হোক, বিবরণ শুনে শিল্পী তক্ষুনি বসে গেলেন কুমির আঁকতে। ফল দাঁড়ালো এই। বড় বড় পা, লম্বা খাড়া কান, লম্বা লেজ। কুমির যে বলতে গেলে বুকে হাঁটে, সে-ব্যাপারটাই ধরতে পারেননি উনি। কুমির নয়তো, যেন নেকড়ে বা হায়না গোছের কোনও প্রাণী! ওঁকে কোনও চিড়িয়াখানায় এনে কুমিরের আস্তানার সামনে দাঁড় করিয়ে দিলে নিশ্চয় লজ্জায় জিভ কাটতেন।

আর, ওই বেচারার যদি আমাদের দেশের কুমিরের গল্পগুলো পড়া থাকতো, তাহলে হয়তো বাঁচার একটা চান্স ছিল। উপেন্দ্রকিশোরের সেই শেয়ালপণ্ডিত আর কুমিরের গল্পটা মনে আছে তো? কুমির যেই না তার ঠ্যাং কামড়ে ধরেছে, শেয়াল একদম ঘাবড়ে না গিয়ে গম্ভীরভাবে বলল, "আরে আমার লাঠিগাছটা ধরে টানা-টানি করছে কে?" বোকা কুমির অমনি ছেড়ে দিল তার পা।

বহুরূপী

বিন্দু বিসর্গ

শিবনাথ শাস্ত্রী তখন কলকাতায় কলেজের ছাত্র। গ্রীষ্মের ছুটিতে একবার বাড়ি গিয়েছেন। কিছুদিনের জন্যে গ্রামের ইস্কুলে ছাত্রদের পড়াতে হল। শিবনাথের বাবা ওই ইস্কুলে পণ্ডিতি করেন, তিনি কিছুদিনের জন্যে ছুটি নিয়েছেন, তাঁর বদলে শিবনাথকে পড়াতে হচ্ছে।

দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্রদের পড়াচ্ছেন একদিন শিবনাথ। সবচেয়ে নিচু ক্লাশের একটি চার-পাঁচ বছরের ছাত্রকে নিয়ে একজন পণ্ডিতমশাই শিবনাথের কাছে উপস্থিত। বললেন, "মশাই, এই ছেলেকে 'পড়' বললেই কাঁদে। কী করি?"

ছেলেটির দিকে তাকালেন শিবনাথ। পণ্ডিতমশাই মিথ্যে বলেননি। ছেলেটির দু-চোখের জলের ধারা পেটের ওপর দিয়ে বয়ে গিয়েছে, তার চিহ্ন আছে।

ভারী আশ্চর্য তো। শিবনাথ বললেন, "'পড়' বললেই কাঁদে? আচ্ছা, ওকে আমার কাছে দিয়ে যান, আমি দেখি।"

ছেলেটিকে শিবনাথের কাছে রেখে গেলেন পণ্ডিতমশাই।

শিবনাথ ছেলেটিকে বললেন, "তুমি আমার হাত ধরে আমার সঙ্গে বেড়াও তো।"

শিবনাথের হাত ধরে বেড়াতে লাগল ছেলেটি। বেড়াতে-বেড়াতে, শিবনাথের যখন বিশ্বাস হল, ছেলেটির মনে আর কোনও ভয় নেই, শিবনাথ ছেলেটিকে তুলে বেঞ্চের ওপর বসালেন। আঙুল দিয়ে পেট টিপতে লাগলেন ছেলেটির। নির্ভয়ে হাসতে লাগল ছেলেটি।

শিবনাথ জিজ্ঞেস করলেন, "বলো তো, কী দিয়ে ভাত খেয়েছ?"

ডাল, চচ্চড়ি, তরকারি। কিন্তু মাছের কথা বলছে না। শিবনাথ ভাবলেন, খুব সম্ভব মাছ খেয়েছে, বলতে ভুলে যাচ্ছে।

শিবনাথ বললেন, "তুমি আরেকটা জিনিস খেয়েছ, আমাকে বলছ না কেন? তুমি মাছ খেয়েছ।"

সত্যিই মাছ খেয়েছে ছেলেটি। তাই সে আশ্চর্য হয়ে গেল। হয়তো ভাবল, পেটের বাইরে আঙুল দিয়ে এই পণ্ডিতমশাই কেমন করে মাছের কথা জেনে ফেললেন? হেসে বলল, "তুমি জানলে কী করে?"

শিবনাথ বললেন, "আমি পেটে আঙুল দিয়ে মাছ খাওয়া ধরতে পারি, তা বুঝি জানতে না?"

ছেলেটির চোখেমুখে এখন আর ভয়ের লেশমাত্র চিহ্ন নেই। শিবনাথ একখানা বই খুলে ওর সামনে রাখলেন। বললেন, "দ্যাখো, তুমি খারাপ ছেলে আর আমি ভালো ছেলে।"

"কেন?"

"আমি পড়তে পারি, তুমি পড়তে পারো না। এই দ্যাখো, আমি পড়ি।"

বলে ক খ গ ঘ পড়ে চললেন শিবনাথ। কিন্তু পড়ে যেতে পারলেন না। ওই ছেলেটিই পড়ে যেতে দিল না। বলল, "আমিও পড়তে পারি।"

শিবনাথ বললেন, "আচ্ছা, পড়ো।"

জোরে-জোরে ক-খ-গ-ঘ পড়ে চলল ছেলেটি।

শেষ পর্যন্ত শিবনাথ ছেলেটিকে সেই পণ্ডিতমশায়ের ক্লাসে নিয়ে গেলেন। সেই পণ্ডিতমশায়কে বললেন, "দেখুন, আপনি বলছিলেন ও 'পড়' বললেই কাঁদে, কিন্তু আমার কাছে তো বেশ পড়ল।"

শিবনাথের চোখে পড়ল, ক্লাশে পণ্ডিতমশায়ের কাছে একখানা বাখারি। ক্লাশের কোনও ছেলে না-পড়লে বা অবাধ্য হলে পণ্ডিতমশাই নিশ্চয়ই ওই বাখারিখানা কাজে লাগান।

শিবনাথ বললেন, "ওই বাখারি দেখলে ও তো বটেই, ওর বাবাও হয়তো কাঁদবে। ও বাখারি আপনাকে ফেলে দিতে হবে।"

পণ্ডিতমশাই বললেন, "তাহলে আর পড়াশোনা হবে না।"

শিবনাথ বললেন, "আচ্ছা দেখুন, আপনার সামনেই আমি পড়াই।"

ইস্কুলের চাকরকে ডেকে শিবনাথ বললেন, "একটা বড়ো মাদুর পেতে দে, আমাদের একটা খেলা হবে।"

লেখাপড়া নয়, খেলা। ক্লাসসুদ্ধ ছেলে শিবনাথকে ঘিরে ফেলল, "কী খেলা হবে?"

শিবনাথ বললেন, "রোসো না, দেখবে এখন, খুব মজার খেলা হবে।"

মাদুরে ছেলেদের নিয়ে বসলেন শিবনাথ। খেলা হবে, খুব মজার খেলা। তবে একটা কথা আছে, খেলার মধ্যিখানে যে গোলমাল করবে, সে কিন্তু খেলার মধ্যে থাকতে পারবে না। রাজী আছে তো সকলে? একবাক্যে রাজী।

খেলা আরম্ভ হয়ে গেল।

লুকিয়ে-লুকিয়ে পেনসিল দিয়ে স্লেটে কী একটা কাণ্ড করছেন শিবনাথ। শেষ পর্যন্ত স্লেটখানা সকলের সামনে বের করলেন। মস্ত হাসাহাসি পড়ে গেল ছেলেদের মধ্যে।

স্লেটে একটা ঘোড়া এঁকেছেন শিবনাথ। ঘোড়াটার জিভ বেরিয়ে আছে। ক থেকে আরম্ভ করে সবগুলো অক্ষর ছড়িয়ে আছে ঘোড়াটার এখানে-ওখানে। জিভে 'ক', লেজের ডগায় 'খ', পায়ের খুরে 'গ'..."

অক্ষর যারা কিছু-কিছু চেনে, তারা চিৎকার করতে লাগল, "ঘোড়ার জিভে ক, লেজে খ, পায়ে গ..."

অক্ষর যারা চেনে না, তারা জিজ্ঞেস করতে লাগল, "কই ভাই, দেখি কেমন জিভে ক, লেজে খ..."

দেখতে-দেখতে খেলতে-খেলতে বর্ণপরিচয় হতে লাগল ছেলেদের। মজার খেলাই বটে।

পরদিন ইস্কুলে ঢুকতেই শিবনাথকে ওই ক্লাশের ছেলেরা ঘিরে ধরল, "পণ্ডিতমশাই, তুমি আমাদের ক্লাশে এসো, আমাদের সঙ্গে খেলা করবে।"

ইন্দ্রমিত্র

REGD. NO. WB/CC 264
ANANDAMELA
দেড় টাকা

আনন্দমেলা